শ্রীশ্রীগুরুবাণী

আচার্য্য শ্রীমদ্‌বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মার

উপদেশ-সংগ্রহ

[redacted]

তদীয় শিষ্যগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত

এবং

১৩২ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

ভাদ্র—১৩৪৭

প্রকাশকের নিবেদন

বিগত ১৩২৬ বঙ্গাব্দ হইতে আমরা গুরুমুখে যে স[illegible]শ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার সার মর্ম্ম তিনি নিজেই 'ঋতম্ভরা' নাম[illegible] পুস্তকাকারে লিখিয়া দিয়াছেন। এই গ্রন্থ বিগত ১৩৩১ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পর আমরা যে সকল উপদেশ পাইয়াছি, তাহার কোনরূপ সংগ্রহ রাখা হয় নাই। এবং ক্রমশঃ আমাদের স্মৃতিপথ হইতে তাহা অন্তর্হিত হইতেছে। বর্ত্তমানের উপদেশসমূহ যাহাতে সংরক্ষিত হয়, এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে অনেকেই আগ্রহশীল হওয়ায়, বিগত গুরুপূর্ণিমা দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া, উক্ত উপদেশ সংগ্রহ ও প্রকাশে আমরা ব্রতী হইয়াছি। ইহার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী উপদেশ যাহা সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে, তাহাও মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইবে।

এই উপদেশ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা সম্বন্ধে কিছু বলাই বাহুল্য। আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছেন, স্মরণ মননের জন্য তাঁহাদের পক্ষেও ইহার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। দূরদেশে বসবাস নিবন্ধন সাক্ষাদ্‌ভাবে উপদেশ পাইবার সুযোগ যাঁহাদের ঘটিয়া উঠিতেছে না, তাঁহাদের ইহা অতিশয় প্রয়োজনীয়। তদ্ভিন্ন যে সকল জিজ্ঞাসু এখনও গুরুসান্নিধ্য লাভ করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে ইহা পথপ্রদর্শকের কাজ করিবে। কাহারও কাহারও নিকট ইদানীন্তন উপদেশসমূহ দুরূহ মনে হইতে পারে, কিন্তু 'ঋতম্ভরা' গ্রন্থখানি অগ্রে পাঠ করিয়া লইলে, এ বিষয়ে ধারণা অনেকটা পরিষ্কার হইবে।

উপদেশসমূহ যাহাতে যথাযথ ভাবে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে আমাদের সাধ্যানুসারে চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি করি নাই। তথাপি ইহাতে যদি কোন ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়, তবে তাহা যে আমাদের অক্ষমতানিবন্ধন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে আমাদের এই চেষ্টা সফল হউক। ইতি।

২৫এ ভাদ্র, ১৩৪৭
কলিকাতা।

বিনীত
শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীগুরুবাণী।

গুরুপূর্ণিমা তিথি

৩রা শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৪৭ সাল।

ব্যক্ত জ্ঞান অব্যক্ত জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। যিনি এই ব্যক্ত জগতে জ্ঞানমূর্ত্তিতে আছেন, তাঁর এই জ্ঞানস্বরূপতা লক্ষ্য করে তাঁকেই আমরা গুরু বলি। আমাদের যত কিছু জ্ঞান, সেই সব জ্ঞানস্বরূপে যিনি নিত্য প্রকটিত হন, তাঁকেই আমরা গুরু বলি। এই জ্ঞানস্বরূপ গুরুকে দক্ষিণায়নের প্রারম্ভের পূর্ণিমার দিন পূজা করিতে হয়।

বর্ষার সময়ে বনে বাস করা কষ্টকর। এ জন্য সে কালের অরণ্যবাসী ঋষিবৃন্দ ও শিষ্যেরা এই চার মাসের জন্য পরস্পর বিচ্যুত হয়ে গৃহাশ্রমে এসে আতিথ্য গ্রহণ করতেন। গৃহস্থেরা এই কয় মাস তাঁদের সেবা করত এবং সঙ্গ লাভ করে উপকৃত হত। একে বলে চাতুর্ম্মাস্য। এই পূর্ণিমা থেকে ইহা আরম্ভ হ'ত বলে এই পূর্ণিমাকে বলে গুরুপূর্ণিমা।

কিন্তু আজকাল তোরা গুরুর নিকটে থাকিয়াও গুরু-বোধহীন; তাই বার'মাসই সবাই গুরুছাড়া। এ জন্য প্রথম

আর চাতুর্ম্মাস্য বলা চলে না—বারমাস্য বলিলেই [illegible] এটা ঘোর তামস কাল। সে কালে তাঁরা ব্র[illegible]সম্পন্ন ছিলেন; তাই তাঁরা গুরুর নিকট হতে দূরে থেকেও গুরুছাড়া হতেন না। কিন্তু আজকাল বার মাসই অন্ধকার। তাই এ যুগেতে গুরু যতক্ষণ না এই পূর্ণিমা থেকে গুরু-অমাবস্যা পর্য্যন্ত নিয়ে যান, ততক্ষণ নিস্তার নাই। সেই জন্য আমাদের এমন গুরু আবশ্যক, যিনি পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা পর্য্যন্ত পথ মুক্ত করে দিবেন।

এই পরমা অমার সাধনা বৈদিক যুগেও ছিল। কিন্তু এ যুগে প্রধান ভাবে এঁকে গ্রহণ করা হয়েছিল। কৌল গুরুরা অমাশক্তিকে গ্রহণ করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমে শক্তিতত্ত্বই হারিয়ে গেল এবং পাঁঠা কাটাই প্রধান হয়ে দাঁড়াল। এ সাধনা যেন ব্রহ্মতত্ত্ব থেকে স্বতন্ত্র জিনিষ—কি এক দেবতা-পূজা, এইরূপ হল এর পরিণতি। কিন্তু ব্রহ্ম যাঁতে বিলাস করেন, এ তাঁহারই পূজা, এই জ্ঞান তোদের রাখতে হবে। অবশ্য ব্রহ্মতত্ত্ব অবলম্বন করে যেতে পারলে যম, নিয়ম, জপ তপের কোন আবশ্যক হয় না। কিন্তু সেটা এ কালে বড় সুগম পন্থা নয়। এখন যেখানেই শক্তির প্রকাশ দেখতে পাই, দেখি—সেটা আসুরিক শক্তি, তাতে ব্রহ্মশক্তির বিকাশ দেখতে পাই না। তাই শারীরিক ও মানসিক সকল শক্তিকে ব্রহ্মশক্তি বলে দেখে আমাদের তাঁকে পেতে হবে। সুতরাং যদিও পূর্ণিমাতেই আমরা গুরুর পূজা করি, তথাপি

[illegible]তে হবে, সেই অমাকেই আমরা পূজা করছি—গুরু বলে [illegible] শুধু জ্ঞানদাতাই নন, গুরু সেই মহাশক্তি, যাঁকে ছাড়া অগ্নি একটা তৃণকেও দাহ করতে পারে না। শুধু জ্ঞানচক্ষু খুলে দেওয়া নয়, "গুরু" শব্দ কানে ঢোকা মাত্র পূর্ণিমার ভিতর, শ্রীর ভিতর সেই যে মহাশক্তি—বজ্রিণী রয়েছেন, এটা দেখতে হবে। তাই যিনি মুক্তকেশ-শক্তিমান্, এমন গুরুকে প্রণাম করি। গুরু কাকে বলে?

দর্শনাৎ স্পর্শনাদ্বাপি মননাৎ স্মরণাৎ তথা।
সিদ্ধিমুক্তি-প্রদাতা যস্তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

যিনি দর্শন করিয়া, স্পর্শ করিয়া, মনন ও স্মরণ করিয়া শিষ্যকে সিদ্ধি ও মুক্তি দিতে পারেন, তিনিই গুরু; সেই গুরুকে আমরা প্রণাম করি। সুতরাং গুরুপূজা করতে গিয়ে এই মানুষটাকে (নিজকে দেখাইয়া) নয়, ভগবতীকে পূজা করতে হবে। কঙ্কালমালী শিব, তাঁর বুক থেকে যে চিন্ময়ী শক্তিকে লহরিত করছেন, আবার গুটিয়ে নিচ্ছেন, তাঁকেই গুরু ব'লে পূজা করি।

এই গুরু তোদের উপর প্রসন্ন হউন (ধ্যানস্থ হলেন)। গুরু আমার সঙ্কল্প পূর্ণ করুন তোদের ভিতর দিয়ে। তোদের মনস্কামনা পূর্ণ হউক। তোরা জয়যুক্ত হ।

গুরুপূর্ণিমা—প্রদোষ।

চিন্ময়ী কত রকমে স্তরের পর স্তরে আপনাকে প্রকাশ করেছেন, ইহাই চিনবার জিনিষ। এই ভূমিতে মাটি, জল, আগুন, কাঠ, পাথর—এই তাঁর রূপ। তার পর তাঁর জ্ঞানের মূর্ত্তি—এ মূর্ত্তিতে এটা জ্ঞান, ওটা জ্ঞান, হাড় মাস জ্ঞান, জগৎ জ্ঞান—সমস্তই জ্ঞানের বিলাস। তার পরে তাঁর আত্মজ্ঞান-মূর্ত্তি—এ মূর্ত্তিতে সবই আত্মা—সকলেই আত্মা; সুতরাং বহু আত্মা। তার পর তাঁর আর এক মূর্ত্তি—আত্মাই ঈশ্বর। অতএব দেখ, চিন্ময়ীই সব হয়েছেন; আমরা তাঁর হওয়া মূর্ত্তিগুলির অনুভূতি করি মাত্র। অনুভূতি হ'ল ক্রমবিজ্ঞান—ক্রমে ক্রমে জানা।

শিব নিজেই নিজের শক্তি, নিজেই নিজের অনুভূতি, নিজেই নিজের সম্ভূতি। নিজেই নিজেতে কিছু হয়ে ফুটে উঠলে দুটো দেখায়—যেন আপনিই দুটো। যখন দেখা, শুনা, ঘ্রাণ করা, এগুলি সব বোধই, তখন এগুলার বিশিষ্টতা ভাঙ্‌লে বোধই পাওয়া যায়। ঈক্ষণ, কাম, বোধ, সং একই জিনিষ। অপার ব্রহ্মতত্ত্বের কূলই হ'ল একত্ব। এক তত্ত্বে সব তত্ত্ব বুঝা যায়।

গুরুপূর্ণিমা—নিশি।

সুখস্বরূপতায় আত্মবোধ অন্ধকারে ঢুকেছে। অম্ + ধ= অন্ধ। অমেতে যা বিধৃত হয়, বাহ্য দৃষ্টিতে তা অন্ধকার। কিন্তু অন্তর্দ্দৃষ্টিতে পূর্ণ সুখস্বরূপ। জ্ঞস্বরূপ যিনি, তিনি হলেন আত্মবোধ। ন জ্ঞ, ন অজ্ঞ, ইনি হলেন সুখবোধস্বরূপ। সব জানবার একটা প্রবণতা—আত্মতত্ত্বের এমনি এক অবস্থা আছে। তাঁরই নাম জ্ঞ—যেন জেনে ফেল্লেই হয়।

কিন্তু "জ্ঞ"তে প্রবিষ্ট হওয়ামাত্রই ভূমা জ্ঞান লাভ করা যায় না। এখানকার একটা অনুভূতি কেবল জ্ঞ। তার পর যে জ্যোতিগুলা—প্রাণগুলা নানা ভাবের ভিতর অস্ফুটভাবে বহু হয়ে ছড়িয়ে আছে, সেইগুলি তাতে মিশে গেলে তখন আত্মাকে ভূমা বলিয়া দেখা যায়। আত্মা সত্য সত্যই বহু। সূর্য্য যেমন সর্ব্বদা বহু কিরণবিস্তারময়, নিজেকেই সে কিরণ-রূপে সর্ব্বদা ছড়িয়ে যাচ্ছে, আত্মতত্ত্বও তেমনি সর্ব্বদা বহু বহু আত্মবিকীরণময়। যেমন সুযোগ পাচ্ছে, একটা বিস্তার বাইরে পাঠাচ্ছে। বহুত্ব ওতে ঢল ঢল করছে। তোমার বা'র ভিতর কিছু নাই। যেখানেই দৃষ্টিপাত কর, আত্মতত্ত্ব ছাড়া কিছু দেখ না, এইটি হওয়া চাই। গাছ দেখি, আকাশ দেখি, মাটি দেখি, সবই চেতনার—আত্মবোধময় চেতনার চেহারা দেখি। আগে আত্মতত্ত্বকে গ্রহণ করতেই হবে।

গাছ ফুটেছে মানেই চেতনা—ভগবতী সেই ফুটেছেন। স এব পুরস্তাৎ, স এব পশ্চাৎ, স এব উত্তরতঃ, স এব দক্ষিণতঃ, স এবেদং সর্ব্বম্। সঃ অর্থাৎ ভগবতী গাছটার ভিতর ফুটেন নি—ভগবতীর ভিতর গাছটা ফুটেছে।

কোন বাকৃই আত্মতত্ত্বকে ডিঙিয়ে ফোটে না। সে হক স্ত্রী, হক পুত্র, হক তোর সুখ বা দুঃখ যত কিছু ভোগের মূর্ত্তি। ওরা আত্মা, তুইও আত্মা—এবার তাঁতে ঢুকে পড়।

এই আত্মাই সব হয়ে ফুটেছেন, এ কথা ঠিক, অথচ এঁকে পাচ্ছি না কেন? আমিও (অর্থাৎ আমি বোধ) আত্মার সঙ্গে সঙ্গে বহু হয়েছি—টুকরা টুকরা হয়েছি। তা হলে তাঁর হওয়া এ সব মূর্ত্তিতে আমিও মিলিত আছি? যেখানে ভগবতী কোন রূপ ধরেছেন, সেখানে আমিও আছি, এইটি জানলেই আমি তাঁর সঙ্গে মিলিত হব। এই দৃশ্য প্রকাশ-গুলো ত জ্ঞান। হিসাবে পাচ্ছি—দৃশ্য নয়, স্বয়ং দ্রষ্টাই। তা হলে ব্যাপারটা এই যে, বহু হয়েছিস্—সুখ, দুঃখ, রাত্রি, দিন, সবেতে বহু হয়েছিস, সুতরাং আত্মা বহু হবার প্রবণতাময়।

আত্মা যেখানে বহু হয়ে ছড়িয়ে পড়েন, তার নাম ভূমা। ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম দিয়ে ধরবার চেষ্টা করিস্ না। নিজের জ্ঞানকে আমার সঙ্গে সঙ্গে এলিয়ে দিয়ে যা—বুঝে যা। সেখানে বহুর এক হয়ে যাওয়া। এদিকে যেমন বহু হবার প্রবণতা, অন্য দিকে দেখ, সুখস্বরূপ হবার প্রবণতা—রতিময়তা। যেখানে প্রাপ্তিগুলো নিজেতে সঞ্চিত হয়ে যায়—মথিত হয়ে

[illegible] তাকে বলে রতিময়তা। রতি মানে যেন, খেয়ে দেয়ে তৃপ্ত হয়ে বিরতি। সুখটা পূর্ণমাত্রায় পরিপূর্ত্তি লাভ করে বিরাম প্রাপ্ত হয়েছে। বাইরে ভোজনানন্দে তৃপ্তি, ভিতরে সেটা সুখের ঢল ঢল চেহারা।

আবার এই খাবার সুখটা পেতে হলে তোমাকে ছুটতে হবে। যখন পেটে জায়গা হল, তখন আবার ছুটলে তুমি খাবার চেষ্টায়। ইহার নাম ব্যাপ্তি (বি+আপ্তি)। ব্যাপ্তি আবার দিলে প্রাপ্তিকে; সেই প্রাপ্তি বল্‌লে—আঃ, কি আরাম! আপ মানে—(১) পাওয়া, (২) জল। সেই জন্য বিষ্ণুকে বলি—আপ্তি, আপ্—জল। বিষ্ণু টাকা পেয়ে ছড়াতে ছড়াতে ছুটেছেন, আর আমি ছুটেছি অভাবের জ্বালায়—টাকাকে পাবার জন্য। জলকে আপ বলেছে; কারণ, জল যাকে পায়, তাকে পেয়ে বসে—তাকে বিদ্রাবিত করে। প্রাণকে এই জন্য বলে জল। ঠাণ্ডা কেউ হয় না—যতক্ষণ না কেউ কোন জিনিষকে পেয়ে বসে। এই আপ্তিকেই আমরা বলি বিষ্ণু—নারায়ণ। এঁর নাম প্রাণ—ইনিই সবাইকে বিধারণ ক'রে আছেন।

সুখস্বরূপ যিনি, তাঁর প্রথম জাগরণ হচ্ছে আত্মা বা আত্মবোধ। আত্মাকে ধাক্কা দিলেই তিনি 'জানা' (জ্ঞানক্রিয়া) হয়ে ফুটবেন। 'জানা'কে ঠেললেই সে তন্মাত্রা হবে এবং তন্মাত্রাকে ঠেল্‌লেই হবে জগৎ। মা আমার এমনি জিনিষ যে তিনি ইচ্ছা করলেই ঐ রকম করে আত্মা, জ্ঞানক্রিয়া,

তন্মাত্রা, জগৎ, সব ফুটিয়ে তোলেন। ঈক্ষণ মানে কামনা করা, বোধ করা, দেখা। ঈক্ষণ মানেই কামনা—চেতন ঈক্ষণময়—তাই কামময়। তাই উপনিষদ্ বলেন,—"সোঽকাময়ত"। আবার আছে,—"স ঐক্ষত"। সব চেয়ে আশ্চর্য্য জিনিষ হল বাক্। ঐ বোধ করা, ঈক্ষণ করা, কামনা করা, ওরই নাম আবার কথা কওয়া, বাক্ ফোটা। কি আশ্চর্য্য! কামনা, ঈক্ষণ, বেদন, কিছুই হয় না—কথা না বললে। বাক্ ফোটা মানেই ভাষা তৈরী হয়েছে। ঈক্ষণ বা বোধ মানেই ভাষায় একটা সর পড়েছে—ক্রমে পুষ্ট হয়ে ব্যক্ত ভাষায় পরিণত হবে। পরম সুখস্বরূপ থেকে সমস্ত ফুটে উঠবার ইহাই ক্রম। চেতনার এই তিনটি বিলাসকে ঋষিদের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—রতি, আপ্তি, ব্যাপ্তি।

যেমন ভাত খাওয়ার দৃষ্টান্ত, তেমনি আমার জন্মটা। জন্মের পর জন্মটা হচ্ছে সুখের এক একটা ঢেউ। কি করে জন্মাচ্ছে দেখ। ভাত খাওয়া একটা রতি থেকে ফুটছে, তেমনি জন্মটা একটা আনন্দ বা সুখস্বরূপের ঢেউ থেকে ফুটছে। গোড়ায় আছে সুখ, না অন্ধকার? এই সুখ-স্বরূপকে ঠেলে দিয়ে তুমি জেগে উঠলে—ভাত খুঁজতে বেরুলে। যাঁকে ঠেলে দিলে—তাঁকে যদি ভাত বলে দেখতে, তবে তোমাকে ভাত খুঁজতে আর বেণের দোকানে যেতে হত না। তুমি যখন ভাত বলেছ, তখন মাকে ভাত দিতেই

[illegible] বল্লেন,—"তুই ভাত চেয়েছিলি, আমিই যে ভাত।" কিন্তু তা তো তুমি দেখলে না। তাই মা বল্লেন,—"যা বেটা, ভাত খা গিয়ে। তোর সংস্কার আমাকে আড়াল করেছে, তাই আমাকে দেখতে দিচ্ছে না।"

কে দিবে আমায় এ জ্ঞান—যে, আমিই ভাত? এ জ্ঞান দিবেন গুরু। ভাত খেতে গিয়ে আমি পরের ঘরে যাব না। যখন বিজ্ঞান পাকা হয়ে যাবে, তখন জান্‌ব, এই যে গাছ, মাটি, জল, এ যে পরম দেবতা চেতনা ছাড়া আর কেউ নয়। এই চেতনা—ভগবতী এই সব হয়েছেন। সুতরাং আমি যখন যাব ঐ মধুতে, তখন আমি মধুনাড়ী দিয়ে যাব, বিষনাড়ী দিয়ে যাব না।

আত্মায় যে বহু হবার প্রবণতা বর্ত্তমান, তাহার প্রমাণ শ্রুতিতেও আছে। যেমন,—"বহু স্যাং প্রজায়েয়।" প্রথম জাগরণেই আত্মা বল্‌লেন—"আমি বহু হব।" আরও যোগদর্শনে আছে,—"দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ।" দৃশি অর্থাৎ জ্ঞ, বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব, ইনি শুদ্ধ হলেও প্রত্যয়সকলকে দেখতে বাধ্য। দেখা মানেই বহু হওয়া। তা হলে দৃশি শুদ্ধ হলেও প্রত্যয়বৎ হবার মত প্রবণতা তাঁতে থাকে। বেদান্তেও ইহাকে বলে, তিনি অনুপ্রবিষ্ট হয়েছেন অর্থাৎ বহু হয়েছেন।

চেতনতত্ত্বে চেতনা হল মানে জানা হল। তোমার নিজের জ্ঞানেতেই নিজের বহু হওয়াটা দেখলে তবে ত

বলবে—আত্মা বহু হ'ল। তত্ত্ব হলেন চেতনা, চে[illegible]া মানে নিজেতেই জানা রয়েছে। এখানে—এই চেতনায় না পেলে তাঁকে ধরি কেমন করে?

মৃত্যুর্দূরং গচ্ছতি যতঃ, সা দুর্গা। মৃত্যু তাঁর কাছ থেকে দূরে যায়, তাই তাঁর নাম দুর্গা। তুমি অজ্ঞান; তাই দুর্গা দেখ নাই। তুমি দুর্গার দূরে, তাই তুমি মৃত্যুকবলিত। নিজেতে না দেখলে দুর্গা দূরেই থেকে যায়। তাই আমরা খালি মৃত্যু পাই। তিনি নিজেই যে সব, এই হল তাঁর মহিমা। এই জ্ঞান আর কারুকে পর ক'রে ফেলে রাখে না। এই সুখস্বরূপ জ্ঞান নিজেই নিজেতে বিস্তার প্রাপ্ত হন এবং নিজেতেই নিজে বিলীন হন। এই যে আমার জ্ঞান—"ইদং সত্যং, সদায়তনং, সৎপ্রতিষ্ঠম্।" "সদায়তনং" মানে এই শরীরটাও সৎ এবং এ শরীর যাঁর আয়তন, তিনিও সৎ—এই হল সত্যপ্রতিষ্ঠা। এইরূপ দেখা হলে তবে সৎ দেখা হল।

আমি হাজার বহির্ব্যাপ্তি নিয়েও আমায় ছেড়ে যেতে পারি না, এও ঠিক। আবার আমি নিজে ছাড়া কেউ বাইরে যেতে পারে না, এও ঠিক। এই জ্ঞানতত্ত্বে যিনি আরূঢ় করে দেন, তাঁর নাম গুরু।

এমন দিন কি হবে আমার, যে দিন এই জ্ঞানই দিবে আমায় টাকা, এই জ্ঞানই দিবে আমায় আয়ুঃ, এই জ্ঞান দিবে আমায় যশ, এই জ্ঞানই দিবে আমায় ব্রহ্মাণ্ড। নমস্তে জ্ঞানমূর্ত্তয়ে।

৫ই শ্রাবণ—রবিবার, ১৩৪৭।

কাম যার আয়তন, মন যার জ্যোতি, হৃদয় যার প্রতিষ্ঠা, ঐ পুরুষের দেবতা স্ত্রী। ধন যার আয়তন, মন যার জ্যোতি, হৃদয় যার প্রতিষ্ঠা, ঐ পুরুষের দেবতা লক্ষ্মী। মৃত্যু যার আয়তন, মন যার জ্যোতি, হৃদয় যার প্রতিষ্ঠা, ঐ পুরুষের দেবতা যম। মন্ত্র যার আয়তন, মন যার জ্যোতি, হৃদয় যার প্রতিষ্ঠা, ঐ পুরুষের দেবতা গুরু। অন্ন যার আয়তন, মন যার জ্যোতি, হৃদয় যার প্রতিষ্ঠা, ঐ পুরুষের দেবতা ক্ষুধা। এখানে তত্ত্ব হলেন চেতন। যে দেবতার নাম যখন বলি, তখন বুঝে নিতে হয়,—তিনি কোন আয়তন নিচ্ছেন। যে কথাটা উচ্চারণ করা হয়, সেই কথাটাই তার আয়তন।

আমার ফুলের দরকার হলে ফুলের জন্য ছুটতে হয় বাগানে। কিন্তু চেতনতত্ত্বে সেরূপ ছুটোছুটি করতে হয় না; সেখানে সবই আছে, কিছুর অভাব নাই, শুধু কেটে নিলেই হয়। ফুল বল্লেই চেতনা ফুলের আকার নিল। এই হল বোধভূমি। এখানে অভাবক্ষেত্র নাই, এখানকার শক্তি হল বাক্। সবই এই ভূমিতে আছে, কেবল কেটে নিতে হয়। সেই কেটে নেবার যন্ত্র হল বাক্। বাক্য উচ্চারণ করার মানেই আয়তন তৈরী হল—বাক্য দ্বারা কেটে বা'র করে নেওয়া হল। তখন আমার মন সেই জিনিষ নিয়ে কাজ

করতে লাগল। "ফুল" বললে ফুলের জ্ঞান হল তার মন, চিন্তা, এ সব এর জ্যোতি।

আমার পুঁজি হল বাক্, আর আমার কাজ হল এখানে কেটে কেটে দেওয়া। বলা মানেই কাটা। যা চাই, সেই জিনিষকে বাক্য দ্বারা কেটে বার করে নিলাম। যেমন কাঠ আছে, আমার চাই খড়ম, আমি কাঠ থেকে খড়ম কেটে বার করে নিলাম। সেইরূপ চেতনতত্ত্বে আমার সঙ্কল্প আদি যা কিছু ভাব, সেগুলাকে বাক্য দ্বারা কেটে বার করে নিলাম। এবং তখনকার চিন্তা, ভাব, সেই বিষয়ের জ্যোতী-রূপে খেলা করতে লাগল।

এই সবের প্রতিষ্ঠা হল হৃদয়ে; যেখানে ভোগ হচ্ছে। যেটা ভোগ হচ্ছে, সেইটাই নিজের সঙ্গে জড়িত হয়ে যাচ্ছে। হৃদয়ভূমি—প্রাণভূমি হল ব্যাপ্তিক্ষেত্র। আমি এখানে ছিলাম, ব্যাপ্ত হয়ে গেলাম, ব্যাপ্ত হয়ে গিয়ে একটা ফুল হলাম। তাতে ধরা পড়ল আত্মাই ফুলরূপে। আর তার মূলেও রইল আত্মাই। যিনি আপনাকে নানারূপে জানেন, তাঁকে নিলাম ফুলরূপে। আত্মাই হলেন ফুল। কালীর খড়্গ চলে গেল—ফুল হল। এই ফুলে ধরা পড়ল আত্মাই। আমি বললাম ফুল, এটা একটা ব্যাপ্তি নিল; কিন্তু ব্যাপ্ত হল ঐ আত্মাই। উপরে রইল ফুল, ভিতরে রইল কাল; কিন্তু মূলতঃ রইল আত্মাই। অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশ চেতনা—যিনি আপনি আপনাকে ফোটান—নানা রূপে জানেন, ফল

[illegible] আকারে। আমার বিশ্ব-দর্শন এই জন্য প্রকৃত পক্ষে দেবতাদর্শন। কিন্তু মাত্র দেবতা নয়—আত্মদর্শন। এই আত্ম-গণ্ডী ছেড়ে, এর বাইরে গিয়ে আমি কিছুই ভোগ করতে পারি না। এই হ'ল ব্যাপ্তিভূমির মহিমা। এই হ'ল মহদ্‌ভূমি বা ব্রহ্মলোকের সূচনা। ফুল, ফল, পাপ, পুণ্য, কালী, দুর্গা, যাহাই চাই, আমি আত্মগণ্ডীর বাইরে গিয়ে কোন জিনিষকে গ্রহণ করি না। এই হল প্রাণ—এই হলেন

আত্মা গতিশীল হলেই তাকে বলি প্রাণ। প্রাণ মানে আত্মবিস্তার। ছেলেকে প্রাণের তুল্য ভালবাসি, যেহেতু ছেলেতে আমি আত্মবিস্তার দেখি। পুত্রে আত্মবিস্তারটা দেখা অভ্যাস হয়েছে বলে পুত্র দেখলেই আমি রসময় হই। একজন "মুচি"—ওর বেলা আত্মবিস্তার দেখি না; কিন্তু পুত্রের বেলা আত্মবিস্তার দেখি। তাই প্রথমেই বল্‌তে হবে,— "এষ প্রাণঃ"। যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহিত হচ্ছেন এবং বিস্তার নিচ্ছেন—ব্যাপ্তি নিচ্ছেন —প্রাপ্তি নিচ্ছেন, তাঁকে বলছি,—"এষ প্রাণঃ"।

আনন্দতত্ত্বে সব হ'ল প্রাপ্তি। আনন্দার্ণবে—সুধার্ণবে সব হ'ল প্রাপ্তি—রতি। পেয়ে ফুরিয়ে গিয়ে যা সারস্বরূপ থাকে, তার নাম সুধা। এই হল ক্ষীরোদার্ণব। ওখানটা হল রতি। চরম তৃপ্তিতে যিনি বিরাজ করছেন, তাঁর নাম ক্ষীরোদার্ণব। এর নাম প্রাপ্তি। অর্থাৎ, নিজেকে পাওয়া—

সব পাওয়া। ক্ষীরোদার্ণব থেকে উঠলেন মানে জ জাগলেন। অর্থাৎ নিজেকে পেলেন—সব পেলেন।

আত্মা মানে স্বয়ংপ্রকাশ—যিনি নিজের সম্বন্ধে নিজে স্বতঃসিদ্ধভাবে স্থির হয়ে থাকেন। আর অন্য সব হল জানা। জানা যত ফুটবে, নিজে থেকেই ফুটবে। জানা জিনিষটা ওই স্বয়ংপ্রকাশ তত্ত্বের ভিতর নিহিত আছে। এই জানাটি এমন জিনিষ যে, যদি কিছু বিশিষ্টতা নেয়, একেই সেই বিশিষ্টতা নিতে হবে। এই জানাটিকে ছড়িয়ে ধরলে এতে ফুটে উঠবে—রূপ, রস, গন্ধাদি সব। যেমন সূর্য্যরশ্মিকে ছড়িয়ে ধরলে সাতটা বিভিন্ন রং দেখতে পাই। এই জানার ভিতরে সর্ব্ববিশ্বের একটা তেজ লুকান রয়েছে। বিশ্ব রচিত হতে হলে এ থেকেই হবে। ফুটে উঠবে মানে সেইরূপ দৃশ্য হবে, সেইরূপ দর্শন বা ভোগ হবে ও দ্রষ্টা হবে।

আত্মতত্ত্ব হাজার বিশুদ্ধ হক, এর ভিতর এমন একটা জিনিষ রয়েছে,—যে বিশ্ব হতে পারে। এই থেকেই বিশ্ব রচিত হয়—এটা স্ফুটনোন্মুখ।

প্রাপ্তির পরে যে তৃপ্তি—আপ্তি—রতি, সেই হল ক্ষীরোদার্ণব। এ সব চেতনতত্ত্বের বিলাস। আত্মতত্ত্ব—চেতনতত্ত্ব, এ সব কথার মানে আপ্তকামতা; ইহা আত্ম-দর্শনময়—আত্মকামময়।

আমি যখন যা কিছু দেখ্‌ছি বা শুন্‌ছি, তার মানে আমি তাই চাইছি। আমাদের মনে হয় বটে, আমি শুনতে চাই

শুনতে হচ্ছে ; কিন্তু তা নয়, আমি চাই, তাই শুনি। জাল পেতে রেখেছে ধরবার জন্য—এই হল কামনা-বিস্তার। ঈক্ষণের এমন বিস্তার যে, একে সব জিনিষ পেতেই হবে ; এর নাম আত্মবিস্তার। পুরুষ কামময় ; আপনাকে আপনি দেখতে চেয়েছে, তাই ত কামনা জেগেছে। আত্মবোধ জেগেছে মানেই সব প্রাপ্তির কামনা ফুটেছে ও আত্মকামী হয়েছে। ওটা হল (১) রতি, এটা হল (২) প্রাপ্তি।

যার আত্মতত্ত্বে বিশ্বাস হয়েছে, তার সব প্রাপ্তি হয়েছে—সে আপ্তকাম হয়েছে। কারণ, সে এমন এক চেতনায় এসে পড়েছে, যেখানে যত কিছু প্রাপ্তি, সব সে পেতে পারে, এ রকম ভাব বা কম্পন রয়েছে। এই জন্য এই চেতনাকে অব্যক্ত অক্ষর পুরুষ বলে। ঐ অক্ষর পুরুষের ভিতর এজন বা কম্পন আছে, তাই ইনিই কাম্পিল্যবাসিনী দুর্গা। কাম্পিল্যবাসিন্যৈ নমঃ।

তৃতীয় স্তর হল ব্যাপ্তি। যে প্রাপ্তি ছিল, সেই হল ব্যাপ্তি অর্থাৎ বিশেষ ভাবে স্থূল ব্যাপ্তির আকার নিল। ওখানে নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, নিরঞ্জন, নিষ্কল ইত্যাদি সব আছে ; কিন্তু কোনও বিশিষ্টতার চিহ্ন নাই। যেমন কাঠের ভিতর অনেক রকম খড়ম আছে, কিন্তু ঐ কাঠটা তা বোধ করছে না। এই হল নির্ব্বিশেষ ভাব। বিশিষ্টরূপে যখন দেখি, তখন হল ব্যাপ্তির ঘর। আত্মা বিশেষ ভাবে আছে অর্থাৎ বৃহৎ হয়েছে।

নিজস্ব, আলপিনে গোঁজার মত ভিন্ন জিনিষে য[illegible]রা যায় না। আগে যে জ্ঞান বাইরে ছিল, তাকে এখন দেখলাম ভিতরে, এ রকমও নয়। বার বললে, উনি সাজেন বার, আবার ভিতর বললেও উনিই সাজেন ভিতর। বার ভিতর সবই এঁর আত্মগত। এই হল আত্মতত্ত্ব।

ব্যাপ্তি মানে প্রাণের ব্যাপ্তি। প্রাণের বিজ্ঞান হল—বহু হয়ে যাওয়া। তাই বহু হওয়া, অন্তর্বহি রচিত হওয়া, এক কথা। এ সব কথা দুরস্ত রাখতে হয়। একটু হারালে একদম সর্ব বিনষ্ট হয়ে যায়। আগে মহান্ আত্মাকে দর্শন করতে হবে; তার পর ব্যাপ্তি, অব্যাপ্তি হয়ে থাকে যাঁতে এবং যা থেকে ফুটে উঠে, তাঁকে দেখবে। ইনি শুধু মহান্ নন, ইনি শুধু অণুও নন; মহান্ ও অণু, দুইই যাঁতে একীকৃত হয়, যাঁর কোন পরিধি বা আয়তন নাই, তিনি হলেন অমাশক্তি। এই অমা বা অপরিমেয়া শক্তিই আত্মশক্তি; আপনি আপনাকে পরিচালিত করছেন। এই থেকেই সব বার হয়—সব মা—সব মেপে মেপে বাহির হয়; মেপে মেপে দেয়—তাই মা। টাকা নাও, পুত্র নাও, আদর নাও, ধর্ম্ম নাও, সব—যেমনটি চাও, তেমনটি। মেপে মেপে দিচ্ছে; আত্মা তাই মা। ব্যাপ্তির ঘর যেখানে সুরু হল, অমনি মা'র ঘরে এলে এবং ব্যাপ্তির ঘর যেখানে অন্তর্হিত হল, তখন আমার ঘরে গিয়ে পড়লে।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু।

এই ব্যাপ্তিময় পুরুষ বিষ্ণু বেরুলেন, প্রাণপ্রবাহ দ্বারা নিজে বেরিয়ে বিশ্বমূর্ত্তি ধরলেন। বিষ্ণুর নাভিতে বসে ব্রহ্মা, সঙ্কল্পময়—মনোময়—দৃশ্যময় পুরুষ বলতে লাগলেন—মন্ত্র উচ্চারণ করলেন এবং এই বলার সঙ্গে সঙ্গে নিজে আকাশ, বাতাস, জল প্রভৃতি হলেন। বিষ্ণু আপন প্রভাবে তাই দেখতে লাগলেন। ব্রহ্মা দেখলেন—বিষ্ণুই দেখছেন; আমি এই আত্মস্বরূপ দেবতাকে দেখছি। এইরূপ দেখার নামই বিষ্ণুত্ব দেখা; এই বিষ্ণুত্ব দেখলেই ব্রহ্মা হওয়া হয়। এক বিষ্ণু বহু হয়ে চারি দিকে ছড়িয়েছেন, একে বলে কেন্দ্র বা নাভি; তা থেকে বহু হয়েছেন। ব্রহ্মা এই নাভিতে বসে দেখেন—আমি আত্মস্থ; আমার আত্মাই বহু হয়েছেন। ব্রহ্মার ব্রহ্মত্বের মহিমা হল এই যে, তিনি দেখেন, আমি এই বিষ্ণুর নাভিপদ্মে বসে আছি। আমি যে তত্ত্বে জন্মেছি, বেঁচে আছি, লয় হচ্ছি—"জন্মাদ্যস্য যতঃ", তার নাম—আত্মার বিষ্ণুত্বদর্শন। এই হল কেন্দ্র। ইহা দেখলেই আমি কেন্দ্রস্থ হলাম। এই কেন্দ্রে বা বিষ্ণুর নাভিতে বসে ব্রহ্মা বেদ (মন্ত্র) উচ্চারণ করছেন আর বিষ্ণু তাই হচ্ছেন। এখন নাভি পেলুম ও বহু হওয়া পেলুম। এইরূপে যে বাক্যের সংস্থান দেখে, তার বাক্য হয়ে যায় মন্ত্র। ব্রহ্মা ভাবের জগৎ দেখলেন, আর বিষ্ণু ভাবের জগৎ সাজলেন। কিন্তু

এই যে জগতের বৈচিত্র্য—বৈশিষ্ট্য, এঁরা কেউ [illegible] করেন না—আত্মাই ভোগ করেন। এঁরা হলেন—নির্ব্বিশেষ ভোক্তা। ব্রহ্মা হলেন "অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ", বিষ্ণুও "অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ।" কিন্তু এর বিশিষ্টতায় যে সব ভিন্ন ভিন্ন রস সঞ্চিত আছে, এর নাম হল আত্মতত্ত্ব। অর্থাৎ তখন তাঁকে তাই হতে হবে এবং তাই ভোগ করতে হবে।

জীব।

যে বিষ্ণু বৃক্ষমূর্ত্তি ধরেছেন, তিনি আবার সেই বৃক্ষত্বের সুখ দুঃখ ভোগ করবার জন্য তাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছেন ও ভোগ করছেন। আগে যা ফুটল, সেটা হল মোটা, সমষ্টি-বহুত্ব। পরে তার ভিতর, তার প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের ভিতর আবার তিনি ছোট ছোট ভোক্তা হলেন এবং সুখ দুঃখ ভোগ করতে লাগলেন। এই দুটার পার্থক্য হল এই—এরা ব্রহ্মার ন্যায় বিষ্ণুর নাভিপদ্মে বসতে পারে না। তাই এরা মধুকৈটভের হাতে পড়ে যায়। এই হল জীবত্ব। ব্রহ্মা ঘুরছেন—বিষ্ণুকে (আত্মাকে) কেন্দ্র করে, আমি ঘুরছি—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবস্থা বা আমার শরীরকে কেন্দ্র করে। ব্রহ্মা দেখছেন—বিষ্ণুই সব, আর আমরা দেখছি—শরীরই সব। আমার শরীর হল সর্ব্বস্ব, এই হল জীবত্ব বা কীটত্ব। আত্মতত্ত্বকে নাভি (কেন্দ্র) করলে অমৃতত্ব লাভ হয় এবং অনাত্মতত্ত্বকে—শরীরকে নাভি করলে মর্ত্ত্যত্ব লাভ হয়। বিষ্ণুকে আমার কেন্দ্রে দেখলে

ছোট ব্রহ্মা হব। এর ফল হবে, আমার বাক্য হবে মন্ত্র—চৈতন।

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব পরীক্ষার উপাখ্যান।

ব্রহ্মা শুনেছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রহ্ম। কথাটা সত্য কি না, পরীক্ষা করার জন্য ব্রহ্মা গোষ্ঠ থেকে শ্রীকৃষ্ণের গাভী-সকল লুকিয়ে রাখলেন। তার পর ব্যাপার কি হয়, জানতে গিয়ে দেখলেন, মাঠে পূর্ব্বের মতই গরু চরছে। তাঁর সন্দেহ হল, বোধ হয় তাঁর অপহৃত গরুগুলা আনা হয়েছে; কিন্তু খোঁজ করে দেখলেন, সেগুলা ঠিকই আছে; অথচ মাঠে পূর্ব্বের মত গরু চরছে। আবার এগুলিও চুরি করলেন; কিন্তু পরে আবার দেখলেন, কি আশ্চর্য্য! মাঠে পূর্ব্বের মতই গরু চরছে। গরুর সংখ্যা একটিমাত্রও কমে নাই। এই সব দেখে তাঁর বিশ্বাস হল, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তখন তিনি তাঁর দর্শন পাবার জন্য ধ্যানস্থ হলেন। তিনি দেখলেন,—তিনি শ্রীকৃষ্ণের পুরীর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। গিয়ে দেখলেন,—চতুর্মুখ ব্রহ্মা পুরীর দ্বার রক্ষা করছেন। তথায় আত্মপরিচয় দিয়ে, ঐ দ্বার পার হয়ে, আর এক দ্বারে এসে দেখলেন, ঐ দ্বার রক্ষা করছেন দশমুখ ব্রহ্মা। পরিচয় দিয়ে ঐ দ্বার পার হয়ে, অপর এক দ্বারে এসে দেখলেন, ঐ দ্বার রক্ষা করছেন শতমুখ ব্রহ্মা। তথায় পরিচয় দিয়ে অপর দ্বারে এসে দেখেন, সহস্রমুখ ব্রহ্মা। তখন বিস্মিত ও হতাশ হয়ে

ঐ সহস্রমুখ ব্রহ্মাকে কৃষ্ণ কোথায় জিজ্ঞাসা করায় তি[illegible] দিলেন,—এই ভাবে অন্বেষী হয়ে খুঁজলে তাঁকে পাবে না। তাঁকে পেতে হলে এখানেই, "জন্মাদ্যস্য যতঃ", এই আত্মতত্ত্বেই পেতে হবে। তখন ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিতে—কেন্দ্রে—আত্মত্বে বসে কৃষ্ণকে দেখতে পেলেন। বহুবাত্মক পুরুষ যদি একাত্মতত্ত্বে বসে ত সে এইরূপ ব্রহ্মত্ব লাভ করতে পারে। তখন তার মর্ত্ত্যত্ব ঘুচে গিয়ে অমৃতত্ব লাভ হয়। তা হলে দেখ, এই সুধাময়ী ভগবতীর দিকে দৃষ্টি ফেরালে কি করে তোমার আমার মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রেরও ব্রহ্মত্ব লাভ হতে পারে। এই চেতনতত্ত্বে দাঁড়ালে অসম্ভব সম্ভব হয়। শ্রুতি আছে,—"স এব লোকঃ" অর্থাৎ তিনি আপনি আপনার লোক। ব্রহ্মলোকে গেলাম ও ব্রহ্মদেবতাকে দেখলাম, এ এক জিনিষ। যেটা দেখে, তার নাম লোক। দেখা মানে আপনাকে সেই আকারে বোধ করা। যে আপনাকে যেরূপ বোধ করে ও বলে, সেই তার লোক। আমি মানুষ বলে আপনাকে বোধ করছি, এটা মনুষ্যলোক। আমি তাই এবং আমি তৎলোকবাসী, এ এক কথা।

আমি ব্রহ্মলোকে গেলাম মানে আমি নিজেকে ব্রহ্ম বলে বোধ করলাম। তোমরা মনে কর, বুঝি আর কোথাও গিয়ে তাঁকে পেতে হবে। তা নয়। এখান থেকে সেই লোকে যেতে হলে আপনাকে গলে যেতে হবে—নিজে অর্থাৎ আমিই সেই দেবতা, এইরূপ মনে হবে। এবং আমার বলে

কিছু আছে, সব খসে পড়ছে। সুতরাং লোকেতে আর লোকীতে কোন পার্থক্য নাই। অর্থাৎ বোধস্বরূপ ও বোধশক্তি একই কথা। অভিজ্ঞ পুরুষ আত্মতত্ত্বে ও শক্তি-তত্ত্বে কোন পার্থক্য দেখবে না।

সাধনার পথ।

প্রথমে তোমাকে কেন্দ্রস্থ—আত্মস্থ হতে হবে অর্থাৎ ব্রহ্মা হতে হবে। এই জীবভাবটা হল ব্রহ্মগ্রন্থি। তোমাকে এই গ্রন্থি ভেদ করতে হবে। এই হল তোমার গতি। তুমি গিয়ে পড়বে তাঁতেই, যিনি সেজেছেন ব্রহ্মা। তখন দেখবে, তিনি আর কেউ নন—তিনি এই 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'। এইটাতে অধিকার হলে তুমিই ব্রহ্মা হয়ে যাবে এবং বিষ্ণুর দর্শন লাভ করবে অর্থাৎ ব্যাপক আত্মা হয়ে যেতে থাকবে। এই দর্শনের ফল হবে মন্ত্রচৈতন্য। তা হলে সত্যবাক্ হবে এবং সত্যসঙ্কল্পময় পুরুষ হয়ে যাবে, যদি এরূপে যেতে পার।

বাক্‌তত্ত্ব।

ব্রহ্মার উপাস্য দেবতা হল বাক্ অর্থাৎ কালী। ব্রহ্মা যা বলছেন, তাই হয়ে যাচ্ছেন—এঁর পুঁজি হল বলা। বিষ্ণুর পুঁজি হল ব্যাপ্ত হয়ে যাওয়া এবং শিবের পুঁজি হল সংহরণ করা অর্থাৎ একলা করা। আদি বাক্‌তত্ত্ব হলেন কালী।

সকল বোধই হল বাক্‌প্রকাশ ; বোধ হল মানে কথা। কথা হল,—(১) একটা ভাবময়, (২) একটা তেজোময়, (৩) একটা পরিস্ফুট কথা। বাগ্‌দেবীকে দেখে যদি আমার এ বাক্য বার হত, তা হলে ক্ষীরোদ সাগর থেকে আত্মবোধ উঠত। আত্মাকে দেখলে—ব্রহ্মশক্তিকে দেখলে মন্ত্রচৈতন্য হয়। ক্ষীরোদ সাগর থেকে আত্মজাগরণ মানে—কথা পরিস্ফুট হওয়া। একটা কথা, একটা বাক্য পরিস্ফুট হতে গেলে তার ভিতর আছে—আত্মবোধ, মহাবিষ্ণু বা মহাব্যাপ্তি,—মহাসম্ভূতি। এর ভিতর আছে একটা অদন—একটা ভোজন। আত্মবোধরূপ একটা তৃপ্তি বিশেষ করে তুলে ভোজন করলেন, এই হলেন আত্মা শক্তি ভগবতী। "অত্তীতি আত্মা"। খালি জিভ দিয়ে খাওয়াই খাওয়া নয়—চোখের খাওয়াও খাওয়া, প্রাণের খাওয়াও খাওয়া—হাঁ করলেই খাওয়া। মা আমার কঙ্কালমালী মহাকালের মূর্ত্তিতে জাগলেন—শিবকে খেলেন। এখানে রতিক্রিয়া হ'ল—মিথুন হল—শিব সৃষ্টি হ'ল। জাগলেন মানে খেলেন এবং খেলেন মানে সৃষ্টি করলেন। "শিবম্ অত্তি" মানে শিবকে সৃষ্টি করলেন। "বিষ্ণুম্ অত্তি" মানে বিষ্ণুকে সৃষ্টি করলেন। "ব্রহ্মাণম্ অত্তি" মানে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করলেন। তোমাকে খেলেন মানে তোমাকে সৃষ্টি করলেন। এইরূপে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে যে ভোগে লাগাতে পারে, সে হল মহাপুরুষ। সুধা-সাগরের গূঢ় রহস্য হল—আপনাকে আপনি খাওয়া। ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরীর

ভিতর চর্ব্বণ হচ্ছে। 'এ চর্ব্বণকে ভয় করো না—চর্ব্বণ মানে গড়ে তোলা।

ব্রহ্মার শক্তি হলেন মহাসরস্বতী, উপাস্য দেবতা হলেন মহাকালী। শিবের শক্তি হলেন মহাকালী, উপাস্য দেবতা হলেন মহাসরস্বতী। বিষ্ণুর শক্তি হলেন মহালক্ষ্মী, উপাস্য দেবতা হলেন মহালক্ষ্মী। বাক্যগুলা বা সৃষ্টি—যা নাকি ব্রহ্মা প্রকাশ করেন, সেগুলা গুটিয়ে নেওয়া হল শিবের কাজ। এই জন্য শিবের উপাস্য দেবতা হলেন বাঙ্ময়ী বা মহাসরস্বতী। শিবের বুকের ভিতর যে বীজময়ী কালী আছেন, ব্রহ্মা তাঁকে বার করেন বা উপাসনা করেন বাঙ্ময়ীর সাহায্যে। সেই জন্য ব্রহ্মার উপাস্য দেবতা হলেন কালী। ব্রহ্মার শক্তি হল ফোটা বাক্য, উপাস্য হল অব্যক্ত বাক্য। বিষ্ণুর বেলা শক্তি ও উপাস্য হলেন একই মহালক্ষ্মী। কারণ, বিষ্ণুর কাজ হচ্ছে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া। তিনি নিজে থেকে নিজেকে বার করেন ও নিজেকে আবার নিজেতেই গুটিয়ে নেন, এ জন্য বিষ্ণুর শক্তি ও উপাস্য এক। আসলে বিষ্ণুর কাজ হল—নিজেকে গুড়িয়ে নেওয়া এবং নিজেকে ব্যাপ্ত করা। ইহাই হল আত্মতত্ত্বের সাধনা।

এই বিশ্ব বাক্যে সৃষ্টি ও বাক্যেই লয় হয়। ব্রহ্মা বাক্যের দ্বারা কালীকে বা আদিবাক্‌কে টানছেন এবং শিব আবার কালী দ্বারা বাক্‌কে টানছেন। তা হলে বাক্যের আরম্ভ ও শেষ এই দুটা মেরু তৈরী হয় থাকে। কিন্তু আত্মতত্ত্বে আর

মেরু রচনা হয় না।' এই যে' বাক্, এ এক জায়গায় [illegible] হয়, আর এক জায়গায় ব্যক্ত হয়। শক্তি এই এক মেরু থেকে অন্য মেরুতে যত গতিবিধি, বোধপ্রকাশ, ছুটাছুটি করছে ; কিন্তু আত্মতত্ত্ব যেমন তেমনি থাকে। সে অক্ষর পুরুষ বা মহাদেবকে দেখলে বিষ্ণুর ব্যাপ্তি ঘুচে যায়। এই হল বিষ্ণুর একার্ণবে শয়ন।

ব্রহ্মার মত বিষ্ণুর নাভিপদ্মে বস। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ', এই হল ভূমি। এই ভূমি তৈরী না হলে চতুর্ভুজা কালী বা দশভুজা দুর্গা দেখার অধিকারই হয় না। এই জন্য 'জন্মাদ্যস্য যতঃ', এইটাকে খালি পুঁজি কর।

৭ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৪৭।

আত্মতত্ত্ব অন্বেষ্য নয় বা দ্রষ্টব্য নয়। শক্তিতত্ত্বই অন্বেষ্য ও দ্রষ্টব্য। আত্মতত্ত্বই দেখে। দেখবার জন্য আত্মাকে আর একটা চোখ বার করতে হয় না। আমি আর কিছুই নই, একেবারে আত্মা—নিজের দ্বারা নিজেকে দেখছি। যে দেখে, তাকে আর কি দিয়ে দেখব? "বিজ্ঞাতারং অরে কেন বিজানীয়াৎ", যিনি নিজেই বিজ্ঞাতা, তাঁকে অন্য আর কিসের দ্বারা জানবে? আমি নিজে আমার আত্মা, এইটাতে বিশ্বাসবান্ হও। তার পর শক্তিতত্ত্ব দেখ। দেখ—যা কিছু দেখছ, এ ভগবতীরই মূর্ত্ত বিলাস।

[illegible]তত্ত্ব আমরা তিন রকমে দেখি,—১। শক্তিকে পরের মত দেখি—যেমন বাতাস বইছে। ২। শক্তিকে আপনার মত দেখি—যেমন আমার সুখ দুঃখ (ভোগ)। ৩। আমিও যা, সেও তা—যেমন আমি মানুষ। সাধারণ জীবক্ষেত্রে সব হয়ে যায় পর। হৃদয়ক্ষেত্র মানে, যেখানে ভোগ করি। এ ভোগ করার অর্থ, যেন উহা নিজেরই হয়ে গেল। ভোগগুলা হয় আমারই অংশ। ভোগ তিন রকমে হয়,—১। আমি ভাত খাচ্ছি—এটা উপভোগ বা বিষয় ভোগ। ২। আমি মানুষ—এই মনুষ্যত্ব ভোগ করছি। যেমন কর্ম্মভোগ—অদৃষ্টভোগ। এগুলো নিজের সামিল হয়ে গেছে। কিন্তু এটাও সম্যক্ ভোগ নয়। এটা ভোগ বটে, কিন্তু বাধ্য-বাধকতামূলক। ৩। আমি মানুষ, এখন আমি পাখীও হতে পারি না, দেবতাও হতে পারি না। কিন্তু যখন ইচ্ছা-মত দেহ ধারণ করতে ও ছাড়তে পারব, তখন হবে সম্ভোগ বা সম্যক্ ভোগ। এখানে বাধ্যবাধকতা নাই, স্বাধীনতা আছে।

সাধারণ ভোগক্ষেত্রে যখন পরকে নিয়ে ভোগ করি, তখন বিহ্বলতা আসে, এর নাম উপভোগ। ভোগেতেও বিমূঢ়তা ও বাধ্যতামূলকত্ব আছে—যেমন আমি মানুষ, এটা ভোগ। সম্ভোগে বিমূঢ়তা নাই, কর্ম্মফলাধীনতা নাই, এটা স্বাধীন ভোগ। ইচ্ছা করলে আমি সুন্দর হতে পারি, পুণ্যবান্ হতে পারি। এটা হল স্বাধীন, এটা হল সম্ভূতিক্ষেত্রের ভোগ—আপ্তকাম পুরুষের ভোগ।

১। জীবক্ষেত্রে পর ও আপন ভাব থাকে, পরা[illegible] থাকে। ২। হৃদয়ক্ষেত্রে সব নিজের হয়ে যায়। ৩। সংস্কার-ক্ষেত্রে আমিও তাই হয়ে গেছি। শক্তিকে এই এত রকম করে আমরা পাই। কিন্তু আত্মত্ব হল এমন জিনিষ, যে নিজেই নিজের শক্তি। তাই এই তিন রকম ভাবে শক্তিরূপে আমরা আত্মাকেই পাই। প্রথমে মনে হবে, আত্মবোধ যেন চিকচিক ক'রে দীপের ন্যায় ভাসছে। তার পরে এ হয়ে যাবে নিজের এবং শেষে এ হয়ে যাবে আত্মাই। এই হল ব্রহ্মবোধ।

একেই বলে সাধনা। যেটাকে পেয়ে বসে আছি, এটা আমার সাধ্য নয়। সাধ্য হলেন সেই তিনি, যিনি ব্রহ্ম-স্বরূপে, হৃদয়স্বরূপে, জড়স্বরূপে বা তেজ, প্রাণ ও মনঃস্বরূপে আমার বুকে বসে খেলা করছেন। এর আরম্ভ হল জড় থেকে—নিজেই মাটি, শক্তি, প্রাণ, বোধ, আত্মা সেজে খেলা করছেন, অথচ এ যাত্রার দলের খেলা বা অভিনয় নয়। শ্রীকৃষ্ণ রাধার জন্য পাগল—সে পাগল ত পাগলই, অথচ সে ব্রহ্ম ব্রহ্মই। সত্যবোধের এই হল মহিমা। আমরা কৃষ্ণ সাজতে গেলে আমাদের কথা—আমি কে, সে কথা মনে থাকে; এ হ'ল লেগে থাকার তত্ত্ব। কিন্তু আত্মতত্ত্ব হ'ল কাটার তত্ত্ব। যেটা সাজছেন, একদম তাই। প্রকৃতিজয়ী পুরুষের এই হল ধর্ম্ম। তোমরা দেখছ—আমিই সূর্য্য, আমিই চন্দ্র; কিন্তু আমি অমুকচন্দ্র, এটি ছাড়' না। আত্মতত্ত্বের

[illegible]ল কাটা গতি। যেখানকার, প্রকৃতি, সেখানেই রইল, অথচ সেখানে গিয়ে অভীপ্সিত রূপ জাগিয়ে তুলবে। সুতরাং আত্মতত্ত্ব অন্বেষ্য নয়, শক্তিতত্ত্বই অন্বেষ্য ও উপাস্য।

আত্মার বুকে ভিন্ন তোমরা কোথাও কিছু দেখেছ? ও ছাড়া আর কেউ কোথাও নেই। সুতরাং ওকে খুঁজবে কোথায়? "আলো"কে যেমন খুঁজতে হয় না, তেমন চেতনকেও খুঁজতে হয় না, উনিই সব খুঁজে নেন। আত্মা দ্বারা বুদ্ধিআদিকে খুঁজে বার করে নিতে হয়, শক্তিকে বার করে নিতে হয়। ওকে কেবল চিন্‌তে হয়।

"কামময়োঽয়ং পুরুষঃ।" একটা কিছু প্রকাশ হল বা কিছু ফুটে উঠল, এ হল কামময়তার জন্য। যেটার সম্বন্ধে যে পরিমাণে জানা আছে, পাওয়া আছে, সেই পরিমাণে কাম জাগে। এই জন্য কাম রতিময়। রতি না থাকলে কাম ফুটবে না। কাম বা কামনা নিজে অনঙ্গ, শিবের শাপে ওর অঙ্গ ভস্ম হয়ে গিয়েছে। ও রতিকে নিয়ে ফুটে বেরুল, এই পর্য্যন্ত। ওটা মাত্র রতির আনন্দের উদ্‌বেলন। ওর নিজের অস্তিত্ব কিছুই নাই, ও অনঙ্গদেবতা; যেটা বেরোয়, সেটাই কাম। যখনই আমি ফুল তুলতে গিয়েছি, তখনই আমার কামময় পুরুষের সাজিতে ফুল তোলা হয়েছে; খালি বাহ্য ক্রিয়াটা বাকি আছে। ঐ ফুলটা আমার চাই—তার মানে ঐ ফুল পাবার তৃপ্তি—রতি আমার বুকে টলটল্ করছে, যদিও তা অব্যক্ত। সুতরাং ঐ সুখটা দ্বারা প্রাণ চালিত হয়,

আমি কানার মত ছুটি। যে কামনা ছুটছে, [illegible]ছে রতির বুকে। আমি নিজে ভূত বলে আমি সেইটিকে জড়ভাবে ফুটিয়ে রাখতে চেষ্টা করছি, প্রচেষ্টা দ্বারা ভূত সংগ্রহ করতে চলেছি। যদি আমার মন্ত্রশক্তি থাকৃত বা আমি নিজেকে চেতন বলে জান্‌তাম, তা হলে আর এ প্রচেষ্টার দরকার হত না। আমি এখানে বসে মনঃশক্তি পরিচালনা দ্বারা ফুল পেতাম। আমাদের দেশে বেদেরাও মনঃশক্তি দ্বারা নানা বৈচিত্র্য দেখাইয়া থাকে।

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" সৎ চিরসত্য, ইহার কখনও অভাব হয় না। সেই জন্য এই সত্য-ভূমিতে যখন আত্মার জাগরণ হয়, তখন তার নাম হয় সর্ব্বজ্ঞ। সর্ব্বজ্ঞ মানে আত্মার জ্ঞত্ব। ওর ভিতর রতি আছে, রতি নিয়েই আত্মা জাগে, তাই আত্মা কামময়।

আমরা অভাবের ঘরে পড়ে আছি, সেই জন্য ভগবৎ-সাধনায় আমি অভাবময় পুরুষ। গুরু উপদেশ দিলেন এবং দেখিয়ে দিলেন, আমি বসে আছি পূর্ণের ঘরে। আমি যার বুকে বসে আছি, সে পূর্ণ। ও আমাকে পূর্ণতা দিয়ে ভরতি করে দিবে। সুতরাং ভগবৎসাধনা করতে বস্‌লে তুমি দেখবে, —যেখানে আমি জন্মেছি, তাতে বসে গেলাম এবং আমার যত অভাব বলে মনে হচ্ছিল, আমি মহিষ বা খণ্ডিত বলে মনে হচ্ছিল, সেগুলা ভগবানের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেল। সুতরাং আমি যত অভাবময় পুরুষ হই না কেন, যখন আমি

ভ[illegible]না করতে বসব, তখন দেখব—আমি পূর্ণ। পূর্ণ মানে হল নিজে।—পূর্ণ আত্মায় নিজেকে দেখতে হয়। ভগবতীতে বসা হ'ল—মূলাধারে বসা। একে ভরতি করতে হবে সহস্রারের দ্বারা।

গুরুরই মূর্ত্তি ভক্তি, গুরুরই মূর্ত্তি তেজ। প্রাণ যখন লাফায়, উদ্‌বেলিত হয়, কড়াতে জল যখন টগবগ করে ফুটতে থাকে, তখন বলি ভক্তি। যখন জলটা বাষ্প হয়ে আকাশে উঠতে থাকল, তখন তৈজস হয়ে গেল, আত্মসাধর্ম্ম্য পেতে লাগল। যেমন গোটা কড়ার জলটা আকাশে মিশে গেল, তেমনি গোটা প্রাণটা তেজে মিলে যায়। "অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ"। এ সব জ্ঞানেরই ভঙ্গিমা। বেলুন থেকে বালুর বস্তাগুলি ফেলে দিলে যেমন সে আপনি উঠে যায়, আর তাকে ঠেলে তুলতে হয় না, তেমনি যখন বল্‌লে,—"অয়মেব সঃ", অমনি চলে গেলে একেবারে যেখানে দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, স্রাতা, প্রাণময় রয়েছেন।

কত দেখিয়ে দিয়েছি; একবার পুঁজিটা ঘাঁট না। শুনছি মানে বলছি, বলছি মানে শুনছি। শুনছি মানে গ্রহীতা, বলছি মানে দাতা। সুতরাং দাতাই গ্রহীতা এবং গ্রহীতাই দাতা। অন্য কথায় ভগবান্‌ই জীব এবং জীবই ভগবান্।

৮ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৪৭।

চেতনার ভিন্ন ভিন্ন স্তরকেই বলছি—রতি, পরমাত্মা, জীবাত্মা, জগৎ। এই কথাটা হারিয়ে যদি ভগবানের কথা কইতে যাও ত সব টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। যেমন আলোতে লাল্ নীল প্রভৃতি হরেকরকম রং রয়েছে, এতে ঘড়ী বাড়ী সব দেখা যায়; এর প্রধান তত্ত্ব হল আলো—যাকে ভূমি করে এসব কথা বলছি—তেমনি ভগবানের কথা বলতে গেলে বুঝতে হবে, চেতনের কথাই বলছি। এটাই হল ভূমি।

শক্তির কথা বলতে গেলে আত্মা যেন আলাদা বলে মনে হয়। কিন্তু আত্মাই যে হরেকরকম সাজছেন, এটা আমরা দেখি না। আত্মাই পরা শক্তি। কোন্ শক্তিকে লক্ষ্য করে বললাম—পুরুষোত্তম, অক্ষর? নাম দিলেই হল শক্তি। যেখানে যে রকম শক্তি লীলায়িত হচ্ছে, তাকে লক্ষ্য করেই বলি শক্তি। কিন্তু বস্তুতঃ বোধস্বরূপ আত্মাই। আত্মতত্ত্ব স্বয়ম্প্রকাশ তত্ত্ব; সুতরাং আত্মা ও শক্তি, এই রকম করে দেখতে গিয়েই যত গোল বেধেছে ও ঝুড়ি ঝুড়ি বিচারশাস্ত্র রচিত হয়েছে এবং আরও কত হবে। তোরা স্বয়ংপ্রকাশকে স্বয়ংশক্তি বলে জানবি। তবেই আর্ষ ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হবি।

সুখস্বরূপের শক্তি হ'ল আনন্দ। পরমাত্মত্ব হল এর ভৈরব। শক্তি যেখানে যে পুরুষত্ব নিচ্ছেন, সেই পুরুষত্ব হল

শক্তির ভৈরব। এই জন্য আনন্দের ভৈরব হলেন জগন্নাথ, পুরুষোত্তম।

আজ আমি এই জীবভাবটাকে লোক করে নিয়েছি, আমি এটাতে তন্ময় সিদ্ধি নিয়ে বসে আছি। ঠিক এই রকম এখানে যেমন ভাবে আপনাকে আপনি হারিয়ে বসে আছি, ওঁখানেও তেমনি অনুভব করা যায়—আমি অক্ষর পুরুষ, আমি বহু, আমি তেজোময় হয়েছি। এই হল লোক থেকে লোকান্তরে গমন। এখানে যেমন হাত পা আছে, সেখানেও তেমনি হাত পা আছে। কিন্তু সেখানে অক্ষরের চোখ, অক্ষরের নাক। এর নাম সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ। ক্ষেত্র-প্রবেশের মানে হল, যে ক্ষেত্রে গিয়ে পড়বে, সেখানে তদ্‌বৎ হ'য়ে খেলা করতে থাকবে। অনুপ্রবিষ্ট পুরুষের ধর্ম্মই হল—তদ্‌বৎ হয়ে যাওয়া।

অক্ষর পুরুষের ধর্ম্ম আপনাকে কেটে দেওয়া। যদি সেখানে কথা উঠেছে—ভূত, অমনি কচ্ করে কেটে গেল। নিজেই, অথচ টুকরা। একটা আলাদা টুকরা ও নিজেতে তফাৎ কি? যখন বলি—টুকরা, এর মানে হল বহির্দৃষ্টি। নিজে বল্‌লে মানে হল অন্তর্দৃষ্টি।

বহিঃ মানে হ'ল—প্রবহণ, বয়ে যাওয়া, বাহির হওয়া। বহিঃ, বহন, বহু, এ সব এক কথা। বয়ে যাওয়াটাও একটা জ্ঞান-মূর্ত্তি। জ্ঞানতত্ত্বের এই অদ্ভুত ব্যাপার—নিজেতেই আছে, অথচ বয়ে যাচ্ছে। এখানে তত্ত্ব হল জ্ঞানস্বরূপ, আর মন্ত্র হল বাক্।

অপরে বলে, এটা একটা মাঁয়া—মরীচিকার খেলা—[illegible] কথার মারপ্যাঁচ—বাচারম্ভণ মাত্র। কিন্তু এ তা নয়। একই বহু হয়, কিন্তু এ হওয়াটা সত্য। এ তত্ত্বই এমন, যেটাই ফুটবে, সেটা একদম সত্য। তিনি যখন জগৎ গড়েন, তখন সেই জগতের জন্ম হয় সত্যলোকে; তার বোধ সত্য, তার সঙ্কল্প সত্য। আমার মনে হচ্ছে, যেন খানিক বাদে এটা নিবে যাবে। কিন্তু যার বুকে এই সত্যবোধ, সত্যসঙ্কল্প আসে, সে ইহাকে তার নিজের অংশ ছাড়া আর কিছু বলিয়া দেখিতে পারে না। কারণ, নিজত্ব থেকে যা বাহির হয়, তা নিজেরই অংশ। বোধের বৈচিত্র্য হল বিশ্ব; সুতরাং বিশ্ব মায়া নয়। সত্যই এই বিশ্ব হয়েছেন—একদম সত্যবোধ। তা না হলে প্রাণ জন্মায় না, প্রাণের খেলাও হয় না। সেই জন্য তোমরা আগে সত্যপ্রতিষ্ঠা কর। তার পর প্রাণপ্রতিষ্ঠা। সত্যবোধ হলে তবে সে জিনিষে প্রাণময়তা আসবে।

'আমি নিজেই' এই ভাবে তোমরা আপনি আপনাকে দেখতে পাচ্ছ। আজ যুবা, কাল বুড়ো—এ সব কি নিজে ছাড়া আর কেউ? নিজে মাটি হয়ে মাটি দেখছ; নিজে জল হয়ে জল দেখছ, নিজে মানুষের চেহারা ধরে মানুষ দেখছ। সকলই এইরকম ভাবে হচ্ছে। তুমি যখন বললে,—বাজারে যাই, তখন কে গিয়েছে বাজারে? চেতনা। তুমি যখন বললে,—হাওড়া যাব, তখন কে গিয়েছে হাওড়া? চেতনা।

[illegible]ব ঘটনা যে ঘটছে, তা ঘটাবার একটা ভূমা ক্ষেত্র আছে —[illegible]ন থেকে সব ঘটছে। সেই ভূমির খেলা এতে রয়েছে। সেই সত্যসঙ্কল্প পুরুষ এক এবং বহু হয়ে রয়েছেন, আর আমি তদধীন জীব, বহু হতে পারি ও বহু হচ্ছি।

সেই সম্ভূতিময় পুরুষ রয়েছেন আর এই যে আমি রয়েছি, এ হুজনে চোখোচোখি হয় কোথায়? নিজের ভিতরে। সুতরাং আমি যখন ভূমা পুরুষকে অনুভব করব, তখন আমি নিজেই তাই হচ্ছি, এটা ধরতে হবে। আমি যখন বলি,—"অহং ব্রহ্মাস্মি," এর মানে হল যে, ব্রহ্ম বিশ্ব সেজেছেন, আমি তদ্‌বোধে সম্বুদ্ধ হয়ে বলছি,—"অহং ব্রহ্মাস্মি"।

ইহাই পরম সত্য। এইরূপ যদি দেখতে পার, তা হলে বুঝব, তোমার সত্যবোধ হয়েছে। সব ভোগেতেই ভগবান্ ছাড়া আর কোন দিকে আমার প্রাণ ছুটছে না, এই বোধ এলে কি সে মানুষ, অভাবের তাড়নায় ছুটাছুটি করে? এ না হলে ভগবান্ রয়েছেন বলে যে স্বীকৃতি, তাও যেন অপরাধ হয়ে পড়ে।

যেমন ভাবে কথা কইছি, সে রকম ভাবেই মা বেরুচ্চেন। যদি বলি,—"হুর্গতিহারিণী," অমনি ফুটে উঠল তেজোময়ী হুর্গা। ঋষি যে বলেছেন—কথাটি আয়তন, এ একেবারে হুবহু সত্য। বোধ, ঈক্ষণ, শক্তি, কাম, এরই অবয়বটার চেহারা হল বাক্। কি অপূর্ব্ব শিক্ষা! কি গভীরতা, দেখতে পাচ্ছ?

বোধপ্রকাশ মানে বাক্‌প্রকাশ। জ্ঞানের ঈক্ষণ মানে

থাক্। তিনি ঈক্ষণ করলেন মানে—ছিলেন তে[illegible] হলেন প্রাণময়; ছিলেন প্রাণময়, হলেন অন্নময়—[illegible]ময়। এত কথার দরকার কি? বল না কেন, মা এখানে কথা বলছেন। এখানে দেবী আমার জ্বলছে জ্বল জ্বল করে, আর বলছে—বিজয়। শুধু আমার বেলা নয়; প্রত্যেকের বেলা। আমরা সকলেই তাঁর এক একটি কথা। সব খেলাই নিজেকে নিয়ে। এ পিঠে দেখতে হচ্ছে, যেন আমি হচ্ছি, ও পিঠে দেখতে হচ্ছে, তিনি করছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেছি, সমুদ্র ও তার ঢেউ। ঢেউ বলছে—আমি ছুটছি, সমুদ্র বলছে—আমি ছুটছি। সেই ঢেউ যখন চুরমার হয়, তার কান্না আর ফুরায় না; সেই সমুদ্রের তখন আনন্দ আর ফুরায় না। এই আনন্দটা দেখে এখানেই মা বলবে?

"যদিদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্ অন্তরাকাশঃ", ঐটাই হল জীবাত্মা। "তস্মিন্ যদন্তঃ, তৎ বিজিজ্ঞাসিতব্যং।...তস্মিন্ শেতে সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বস্য ঈশানঃ।"

৯ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৭।

ঋষি আনন্দের যে বর্ণনা করেন, তাহা এইরূপ,—কোন যুবা পুরুষ যদি সচ্চরিত্র, বলিষ্ঠ, দৃঢ়শরীরী, অধ্যয়ননিষ্ঠ ও আশাপরায়ণ হয়, এবং বিত্তপূর্ণ এই সমগ্র পৃথিবী যদি তাহার আয়ত্ত হয়, তবে তাহার যে আনন্দ, সেই আনন্দের নাম এক

[illegible]ানন্দ। মানুষ আনন্দের শতগুণ মনুষ্য-গন্ধর্ব্বলোকের আনন্দ, তাহার শতগুণ দেবগন্ধর্ব্বের আনন্দ, তাহার শতগুণ পিতৃলোকের আনন্দ, তাহার শতগুণ আজানজ দেবগণের আনন্দ, তাহার শতগুণ কর্ম্মদেবগণের আনন্দ, তাহার শতগুণ দেবগণের আনন্দ, তাহার শতগুণ এক ইন্দ্রের আনন্দ, তাহার শতগুণ এক বৃহস্পতির আনন্দ, তাহার শতগুণ প্রজাপতির আনন্দ, তাহার শতগুণ ব্রহ্মলোকের আনন্দ।

আনন্দের এই প্লাবনে ভেসে যাবার মত নগ্ন হতে পারছি না, কাপড় জড়িয়ে যাচ্ছে। এ আনন্দের দাম এত, এ আত্মানন্দ বলে; নিজেকে নিজে পূর্ণমাত্রায় পাবার আনন্দ। নিজেকে নিজে পেলে যে বিদ্যুৎ খেলে ওঠে, এ সেই আনন্দ। পয়সা পেলে, পুত্র পেলে, বিষয় পেলে সুখ আছে তোমরা জান; কিন্তু নিজেকে পেলে যে কি সুখ, তা তোমরা জান না। নিজেকে পূর্ণমাত্রায় পাওয়াই ব্রহ্মকে পাওয়া। তাই ব্রহ্মবাদের পথে চলতে হলে নিজত্বের বিস্তার নিতে হয়; নিজেকে ছড়িয়ে দিতে হয়।

যেখানে যা দেখি, নিজস্বরূপ চেতনাকেই দেখি। এঁকে উল্লঙ্ঘন করে কোথাও কিছু পাচ্ছি না। যাতে প্রবেশ করলে আর কিছু থাকে না, সব নিঃ অর্থাৎ নাস্তি হয়ে যায় এবং যা থেকে আবার সব জাত হয়, তাকে বলে নিজ। "নিঃশেষেণ প্রবিশতি, জায়তে চ যতঃ পুনঃ। স নিজঃ..." এমন যে নিজস্বরূপ, ইনিই আত্মা।

সাংখ্যবাদীরা যে "সম্প্রজ্ঞাত সমাধি"র কথা বলে এবং আমি যে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনের কথা বলি, এ উভয়ই যে এক, ইহা তোমরা বুঝিতে পার কি? তারা বলে, একটা বস্তু অবলম্বন করে তাতে সমাধি নেও, একেবারে তাই হয়ে যাও। তখন সেই বস্তু সম্বন্ধে যত কিছু জ্ঞান, সব তোমার প্রজ্ঞায় ফুটে উঠবে। আমার কথা হল, তুমি ঐ বস্তুকে ব্রহ্ম বলে দর্শন কর, তা হলে তুমি একই ক্ষেত্রে উপনীত হবে।

তুমি যদি গাছে সমাধি নিতে চাও, তবে গাছের ব্রহ্মত্ব দর্শন কর; দেখ—"বৃক্ষ এবাধস্তাৎ, বৃক্ষ উপরিষ্টাৎ, বৃক্ষঃ পুরস্তাৎ, বৃক্ষঃ পশ্চাৎ, বৃক্ষ উত্তরতো বৃক্ষো দক্ষিণতঃ, বৃক্ষ এবেদং সর্ব্বম্।" যদি এরূপ দেখতে পার, তবে দেখবে, তুমি বৃক্ষ হয়ে গেছ। এবং কিছুক্ষণ এই ভূমিতে অবস্থান করলে তখন বৃক্ষের ধর্ম্মসকল তোমাতে প্রকাশ হতে থাকবে। এর নামই বৃক্ষের ব্রহ্মত্ব দর্শন বা বৃক্ষে সমাধি নেওয়া। এই জন্যই ভগবান্ গীতায় বলেছেন,—"যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তৎ যোগৈরপি গম্যতে।" ব্রহ্মবাদ আর সাংখ্যবাদে এই হল তফাৎ। তোমরা ঘর সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাক, তোমাদের পক্ষে ব্রহ্মবাদের রাস্তাই প্রশস্ত। সাংখ্যের রাস্তা তোমাদের জন্য নয়। সাংখ্য বলে,—সব ত্যাগ কর। ব্রহ্মবাদ বলে—যখন মনের তলায় আত্মা, বুদ্ধির তলায় আত্মা, অন্তরে আত্মা, বাহিরে আত্মা, সবই যখন আত্মময়, তখন আত্মার ধর্ম্মই দেখ।

স্থিরাস্থিত যে চেতনা, এঁর নাম ভগবতী; এঁকে আর ভোগচেতনা ব'লে পাই না। এঁকে বলে বর্ষণশীল চেতনা। বর্ষণ, বর্ষ, বৃষ, এ সব এক কথা। বৃষ হল কাল, এঁকেই ধর্ম্ম বলে এবং ইনিই মহাদেবের বাহন। ধর্ম্ম মানে যিনি ধরে বসে আছেন; শুধু ধরে থাকা নয়, ফুটিয়ে ধরে আছেন, নিজে হয়ে ধরে আছেন। বৃষ থেকে কাল ও দিক্ বর্ষিত হয়। বৃষ যখন প্রধাবিত হন, তখন তাঁ থেকে কাল ও দিক্ ফোটে। এই বিশ্ব ফুটে রয়েছে কালে। কালও একপ্রকার বোধক্রিয়া, বোধ মানেই কলন; কলনই কাল। কলন করা মানে নিয়ন্ত্রণ করা বা যমন করা—সমস্তকে নিজের অধীনে রেখে পরিচালনা করা। এই বৃষে বা কালে বসে আছেন মহেশ্বর, তাই তিনি মহাকাল।

দিক্ হল কালের বাহ্য অভিব্যক্তি—মহাস্থিতির বাহিরের অভিব্যক্তি। কাল যখন বর্ষিত, ধাবিত হয়, তখন দিক্ ফোটে। তখন ওরাই—দিক্সকলই হয় প্রাণ। বর্ষণ মানেই প্রাণ। তাই প্রাণের প্রবাহের নাম দিক্। শ্রুতিতেও আছে,—"প্রাচী দিক্ প্রাঞ্চঃ প্রাণা দক্ষিণা দিগ্দক্ষিণে প্রাণাঃ প্রতীচী দিক্ প্রত্যঞ্চঃ প্রাণা উদীচী দিগুদঞ্চঃ প্রাণা ঊর্দ্ধা দিগূর্দ্ধাঃ প্রাণা অবাচী দিগবাঞ্চঃ প্রাণাঃ সর্ব্বা দিশঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ।" বোধ হল মানে কাল ক্রিয়াশীল হল। নিরবচ্ছিন্ন আত্মবোধের উপর একটা চঞ্চল বৈদ্যুতিক শক্তির ফোটা, থাকা ও লয় হওয়া দেখা যাচ্ছে। সে আত্মার নিজেকে

খণ্ডিত করছে, ইহাও দেখা যাচ্ছে। আবার নিজেকেও দেখা যাচ্ছে। সুতরাং তিনি নিজেকেই এক ও বহু করে দেখছেন। এই হল দর্শনের ক্রম। এ থেকে বোধস্বরূপের একটা গতি অনুমিত হচ্ছে, এই গতিই হল কাল—আদিশক্তি। একে যতক্ষণ না মহাকাল বলে চিনবে, ততক্ষণ গুরু বলা হবে না।

যেটি তোমার অস্তিত্ব, তাহা এখন এই চেহারা নিয়ে লাফালাফি করছে। এই চেহারাটি হল তোমার আয়তন। যে এই আয়তনের মূর্ত্তি ধরে, তাকে না চিনলে মুক্তি হবে কি ক'রে? তুমি করতে যাচ্ছ মন্ত্রচৈতন্য—করতে যাচ্ছ বাক্‌সিদ্ধি; সুতরাং তোমাকে তোমার আয়তনের পরিবর্ত্তন করতেই হবে। সমস্ত আয়তনের আয়তন যিনি, তাঁকে তোমার পেতেই হবে; তিনি হচ্ছেন কাল। জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান মানেই মহাকাল—খণ্ডের উপর বসে আছেন। খং খণ্ডত্বং দদাতীতি খণ্ডঃ।

অক্‌সিজেন পেলে আগুন যেমন দপ্ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি এই প্রাণ, কালপ্রবাহে পড়লে জাগবেই। এ আপনি আপনাকে কেটে বার করছে, এই জন্য একে বলে "ক্ষেত্রজ্ঞপ্রতিহন্ত্রী।" ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে প্রত্যগাত্মা বলে। তুমি ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ নিজেকে নিজে দেখছ; কিন্তু যখন উনি ধরলেন তোমায় চেপে একটা রোগের ভিতর, তখন ক্ষেত্রজ্ঞকে, প্রত্যগাত্মাকে, নিজেকে আর দেখতে পাচ্ছ না, রোগের জ্বালায় ছটফট করছ। উনিই দেখতে দিচ্ছেন না। তাই উনি

ক্ষেত্রজ্ঞপ্রতিহন্ত্রী। অনেক চেষ্টা করে কিছু করলাম, দিলে একটা আঘাত, সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। এই রকম করে তোমার শরীরটাকে নিয়ে যে চালাচ্ছে, সে হল ক্ষেত্রজ্ঞ-প্রতিহন্ত্রী। আত্মবোধ যখন যে পরিবর্ত্তনের স্রোতে পড়ছে, তখন আত্মার আয়তনও সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিবর্ত্তন নিচ্ছে। যে রহস্যময়ী শক্তি এই পরিবর্ত্তন ঘটাচ্ছে, তার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ-প্রতিহন্ত্রী।

গুরুদর্শন—জ্ঞানমূর্ত্তি দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে উমা নেমে আসছেন। এ গুরুমূর্ত্তি যত প্রকাশিত হতে থাকবেন, ততই আত্মমূর্ত্তির ঘনীভূত ভাব বা আনন্দ ফুটতে থাকবে। ওঁর—গুরুর ভিতরকার গুহ্য মূর্ত্তির নাম কালিকা। কাল ব'লে যে তেজকে অক্ষর আত্মা বলা হয়, তাঁর প্রকাশে ধ্রুবা স্মৃতি জাগে। ওঁর—কালের পেটের ভিতর হিংকার রয়েছেন; ইনিই হৈমবতী। হৈমবতীর পেটের রহস্য বিদ্যার নাম ব্রহ্মবিদ্যা। ইনি সব হতে পারেন, আবার সব মারতে পারেন।

শক্তিতত্ত্ব এই রকম করে বুঝতে হয়। আত্মায় যে সব মোড়া, এ ত ঠিকই। কিন্তু রহস্যময়ী যে শক্তি আত্মার ভিতর রয়েছেন, তাঁকে দেখতে হবে। শক্তিত্ব না পেলে শুধু আত্মত্বের দাম কি আছে? শক্তিত্ব পেলে আনন্দ জাগে। "যা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ, যঃ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা" এ কথাটার সার্থকতা এইখানে। প্রজ্ঞা হলেন আত্মা, আর শক্তি হলেন

তাঁর প্রাণ। শুধু মা দেখলে হবে না; সঙ্গে সঙ্গে অমাকেও দেখতে হবে। একটা জীবত্বের ভিতর পুরে দিয়ে মা কেমন হাস্‌ছেন দেখ ত। ওঁকে চিন্‌লে ওঁর এই হাসি বন্ধ হবে। উনি যেমন প্রতিহন্ত্রী, আমিও তেমন প্রতিবল। "যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি।" আমি তোমায় চিনেছি; যত রকম হাসিই তুমি হাস, নিজত্ব ছাড়িয়ে তোমার কোথাও যাবার জো নাই। আত্মত্বের আবরণ তোমার গায়ে নিতেই হবে। মা বললেন,—বৎস, আমি এলাম দশভুজা মূর্ত্তিতে—তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতে। আমি বলি—এস মা, কিন্তু "ন গুরোরধিকম্"—তুমি গুরুর বাইরে নও।

এই যে প্রজ্ঞামর দেবতা, এতক্ষণ ধরে যাঁর সেবা করলাম, তাঁর উপরকার ছালটার নাম হল আয়ু। ইনি মৃত্যুঞ্জয়। এঁকে দেখলাম মানে মৃত্যুকে সরিয়ে দিলাম এবং আয়ু লাভ করলাম। চিন্তা, ধারণা, এ সবের স্থান এখানে নেই। এ আশুতোষের ভূমি—বলেছ কি পেয়েছ। এই সব উপদেশ যখন শুনছ, তখন ভিতরে একটা আনন্দ ঠেলে উঠছে, যেন বেঁচে গেলাম—এই রকম একটা ভাব। এই হল উলুধ্বনি। উপনিষদে একে বলেছে—উল্লুলব।

এখন ধর্ম্ম বলে কি বুঝলে? এই যা শুনলে, ইহাই প্রকৃত অভ্যুদয়। তাই তোমাদের অন্তরে উলুধ্বনি বেজে উঠছে। সহস্রারে চড়ে থাক, এখানে অপুনরাবর্ত্তনের

আস্বাদন পাবে। বুকের ভিতর নেমে কোথায় কি পাবে? একটু আধটু গায়ে লেগে থাকবে মাত্র।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥

১০ই শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৪৭।

ঈশানত্বের আরম্ভ হ'ল পুরুষোত্তমে এবং অভিব্যক্তি অক্ষর আত্মায়। এই জন্য ঈশ্বর বলতে গেলে আমরা অক্ষর আত্মাকেই বলি। এই ঈশ্বর হলেন নিয়ন্তা। আবার দেবতাও ইনিই। যিনি অনন্ত শক্তিরূপে প্রবাহিত হচ্ছেন, তিনি দেবতা—শক্তিসমূহমূর্ত্তি। আবার এঁকেই পতি বলি; কেন না, জীবত্বের পোষণকর্ত্তা ইনিই।

আমাদের ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদাই আমাদের উপর প্রভুত্ব করে। চোখ বলে—সৌন্দর্য্য দেখব, কান বলে—মধুর স্বর শুনব, নাক বলে—সুগন্ধ আঘ্রাণ করব, রসনা বলে—মিষ্ট রস আস্বাদন করব, ত্বক্ বলে—সুশীতল কোমল স্পর্শ করব। শুধু বলা নয়; উহারা আমাদিগকে সেই সেই বিষয়ে নিয়োজিতও করছে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে দেখি, ইহারা সকলেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে চেতনা দ্বারা। এই হল ঈশিত্ব।

আবার দেখি, আমাদের যত শক্তি, সমস্তই ইন্দ্রিয়ের ; কিন্তু সূক্ষ্মে দেখলেই দেখতে পাওয়া যায় যে, এ সকল শক্তি চেতনারই ; এই হল দেবত্ব—শক্তিসমূহমূর্ত্তিত্ব। আরও দেখি, ইন্দ্রিয়গণই আমাদের পোষণ করছে, পালন করছে ; কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখি, চেতনা ছাড়া কেউ কিছু করে না—এই হল পতিত্ব। সুতরাং চেতনাই ঈশ্বর, চেতনাই দেবতা, চেতনাই পতি। তার পর আরও দেখি, তিনি মাত্র আমাদের অধ্যাত্ম জগতের নন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও ঈশ্বর, দেবতা ও পতি। তাই বলছেন,—ভুবনেশং, দেবং ও পতিরূপেণ ঈড্যং স্তুত্যম্। এতাদৃশং ব্রহ্ম বিদাম—তাঁকে আমরা জানি, দেখি, পাই ও তাই হই।

ঈক্ষণ তিন প্রকার,—১। অনির্ব্বচনীয়ের ঈক্ষণ অর্থাৎ আপনি আপনাকে ঈক্ষণ করছেন ; ইহা তেজোময় আত্মবোধ এবং ইনি হলেন মহেশ্বর। ২। অক্ষর পুরুষের ঈক্ষণ। যিনি তেজোময়, তিনি কামময় হলেন। "তদৈক্ষত"—তিনি বহু হলেন, প্রাণময় হলেন, বিষ্ণু হলেন। ৩। বিষ্ণুর ঈক্ষণ—"আপ ঐক্ষন্ত"। প্রাণময় বিষ্ণু অভিব্যক্ত হয়ে মনোময় হলেন ; ইনি হলেন ব্রহ্মা। এই তিনটী ঈক্ষণের দ্বারা চারটী অবস্থা লক্ষিত হয়,—১। আনন্দময় অবস্থা—সমগ্রটা অব্যক্ত-ভাবে আছে, এইরূপ ভাবের যে তেজ, তাহার নাম অব্যক্ত আনন্দময় অবস্থা। ২। তেজোময় অবস্থা। ৩। প্রাণময় অবস্থা এবং ৪। স্থিতিশীল অবস্থা। জীবত্বের ভিত্তিই

হল চিন্তা অর্থাৎ একজন আর একজনকে দেখছে, শুনছে, চিন্তা করছে, ইহাই জীবকে উদ্বুদ্ধ করিয়া রাখে এবং ইহা যখন বন্ধ হয়, তখন তাহার আসে ঘুম বা অজ্ঞানাবস্থা। আর উনি আপনি আপনাকেই দেখছেন, পর কিছু দেখছেন না; তাই ওঁর নাম আনন্দ। আনন্দই হল ওঁর ভিত্তি। উনি নিজেই উপাদান ও নিজেই নিমিত্ত।

আত্মত্বে এই যে পুরুষোত্তম, অক্ষর ও আধিযজ্ঞ পুরুষ, এর কোনটিকেই অস্বীকার করা যায় না। যোগশাস্ত্র স্বীকার করেছে যে, "দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ।" তিনি একান্ত শুদ্ধ হলেও প্রত্যয়ের আকার নিতে পারেন। এই কথাটির মধ্যেই শক্তিতত্ত্বের বীজ লুকান আছে। আত্মায় এই যে বিশিষ্টতা গ্রহণ করবার শক্তি রয়েছে, এ হ'ল জীবপ্রসবিনী শক্তি। আত্মার আর একটি অবস্থা আছে—অসঙ্গত্ব বা অক্ষরত্ব। এই অক্ষরত্বে বিশিষ্টতা গ্রহণের আলাদা শক্তি পাচ্ছি না। আত্মার তৃতীয় অবস্থা পুরুষোত্তম বা আনন্দময়ত্ব। যে শক্তি দেখে তাঁকে আনন্দময় বলি, সেও আত্মারই আর একটী শক্তি। সুতরাং আমাদের যথার্থ আত্মা বলা ততক্ষণ হবে না, যতক্ষণ না বিভিন্ন শক্তি এঁতে দেখতে পাই।

প্রতি কথার বিশিষ্টতা লক্ষ্য করে তবে ভগবৎকথা বলতে হয়। কোথাও গোঁজামিল দেবে না। কেন না, যা বলছ, তাই তুমি হচ্ছ, এই হল জ্ঞানরাজ্যের বিজ্ঞান। কথা কইছ মানে—লোক থেকে লোকান্তরে চলে যাচ্ছ, সেই

লোকের অধিবাসী হচ্ছ, আর সেই বিষয়টির আধার-শক্তি হয়ে তাকে ধরে রেখে দিচ্ছ। তুমি দুর্গা বললে দুর্গালোকে যাবে, একজন সিদ্ধ পুরুষ দুর্গা বললে তিনিও দুর্গালোকে যাবেন। কিন্তু তোমার দুর্গা হবে মাটির দুর্গা, আর তাঁর দুর্গা বলবে,—"এস বৎস, বর লও।" ধর্ম্ম জিনিষটা এইরূপ একটা প্রত্যক্ষতার জিনিষ। ঐ ঘরে মা আছেন, তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম; এরূপ না দেখলে জপতপগুলার কোন দাম নেই। জ্ঞানের উপাসনা কর। কথা বলার ভিতর যে মহাকাল বিরাজ করছেন, তাঁকে দেখ।

মহাকাল লয়াত্মক ও সৃজনাত্মক। তিনি যখন প্রথম ফুটলেন, তখন চার পা নিয়ে ফুটলেন। তাই তাঁর বাহন বৃষ চতুষ্পাদ। ক্রমে তিন পাদ হ'ল, তার পর দুই পাদ, তার পর একপাদ। শেষে পাদশূন্য হয়ে যাবেন অর্থাৎ কাল প্রলীন হবে। তুমি যে ষাঁড়ে বসে রয়েছ, এ ষাঁড়ের কটা ঠ্যাং? এ ষাঁড় একপাদ কলি। আমরা সব চলেছি লয়ের দিকে। শুনতে পাওয়া যায়, সত্যযুগে মানুষের পরমায়ু ছিল হাজার বছর। অথচ উপনিষদে দেখা যায়, তখনও মানুষের পরমায়ু ছিল এক শত বছর। এখনও তাই। এর ভিতর সামঞ্জস্য কোথায়? তাদের আয়ুজ্ঞানের উপর একটা সুদীর্ঘ স্থিতি খেলা করত; আর আমাদের উপর কালদেবতার সম্পাত অলক্ষিত ভাবে চলেছে। আমরা উৎপীড়িত হচ্ছি সমস্তাভাবের দ্বারা। সর্ব্বদা গেলুম গেলুম, মলুম মলুম ভাব।

তাই এ যুগে ঘড়ীর আবিষ্কার হয়েছে। এমন সব পোকা আছে, যারা নাকি এক ঘণ্টা বাঁচে। কিন্তু তারা ঐ এক ঘণ্টার ভিতরেই জীবনের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে নেয়। তখনকার দিনে তারা দেখত—আয়ু সুদীর্ঘ; আয়ুর একটা সুদীর্ঘ পরিস্থিতি তারা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করত। মৃত্যুর ছায়া তাদের বুকে পড়ত না। আয়ু—আনন্দ, এই ভাব তাদের প্রধান ছিল। আর আমরা কলির জীব। সর্ব্বদা মৃত্যুভয়ে কাতর। আমাদের আয়ু মৃত্যুদ্বারা পরিচ্ছিন্ন।

কালতত্ত্ব জানলে কাল বিজিত হয়। নিজত্ব ব'লে যে তত্ত্ব, এঁতেই কাল জাত হয়ে থাকে। সুতরাং নিজত্ব কালাধীন নয়। সর্ব্ববিধ বোধ, স্থূলভুক্ থাকা পর্য্যন্তই কালের প্রকাশ। বোধ যেখানে নিজভুক্, সেখানে কালের প্রকাশ নাই। এই যে নিজভুক্ আত্মা, যেখানে কালভয় বিদূরিত হয়ে গেছে, সেখানে আত্মার মুখে হাসিও দেখবে না, কান্নাও দেখবে না; সেখানে বিরাজ করছে আনন্দ। আমি কালের সংহর্ত্তা ও প্রসবকর্ত্তা, এইটি দেখলেই অর্থাৎ তেজের তেজ দেখলেই আনন্দ। এখানে আত্মা উলুধ্বনি দেন, এই হল আনন্দের স্ফুরণ।

আমার টাকা আছে, বিদ্যা আছে, বল আছে, এই হল তোমার তেজাত্মক ভাব। এর সঙ্গে একটা পরম পরিতৃপ্তি, পরম শমতা রয়েছে, আমার ভাবনা কি? এইরূপ নির্ভাবনা ভাব। যেমন যজ্ঞবাড়ীর কর্ত্তা যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার সব আয়ত্তাধীন,

করে রাত্রে নিশ্চিন্ত ভাবে থাকেন। এই ঠাণ্ডা ভাব হল আনন্দ; এটা তেজেরও উপরে। তেজের দ্বারা যেমন আয়ু বৃদ্ধি হয়, তেমনি তেজের দ্বারা আয়ুক্ষয়ও হয়। কিন্তু তেজের তেজকে—আনন্দকে দেখলে কাল স্তব্ধ হয়ে যায়।

নিজ বলতে শুধু এই শরীরটা নয়। এখানকার ইন্দ্রিয়াদি, পঞ্চ তন্মাত্রা, অহংস্থিতি, কালাত্মক ভোগভূমি, এই সব যাঁতে গিয়ে পরিসমাপ্ত হয়, তাঁর নাম নিজ। "ন অতঃ অন্যঃ অস্তি দ্রষ্টা," ইত্যাদি শ্রুতি যাঁকে লক্ষ্য করে বলা হয়, তিনি হলেন নিজ। তুমি কি নিজে এই রকম হলে? তুমি মনে করছ—হলে; কিন্তু এটা হবার সূত্রপাত মাত্র। কেন না, যেখানে যত আত্মা আছে, সে সব আত্মা তোমার ঐ নিজত্বে পরিদৃষ্ট হচ্ছে না। তাই তোমার হওয়াটা এখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। তুমি আরও যখন কালবোধে ঢুক্‌বে, তখন তোমার ধ্রুবা স্মৃতির ঘরটা উঁকি মারতে থাকবে, চমক্ দিতে থাকবে। যে পুরুষের এ রকম দর্শন হয়, তার প্রাতিভ জ্ঞান ফুটে উঠতে থাকে, রূপ রসাদির দিব্য জ্ঞান অর্থাৎ অনন্ত রকম দর্শন শ্রবণাদি ফুটতে থাকে। ঐ ধ্রুবা স্মৃতির ঘরে দিব্য গন্ধ, দিব্য রস, দিব্য রূপ ইত্যাদি সব আছে। সেই দিব্য গন্ধ, দিব্য রস, দিব্য রূপ প্রভৃতি যতক্ষণ না তোমার ভিতর ফোটে, ততক্ষণ তোমার এই জীবত্বের অহংএর কাছে তিনি চিরউপাস্য। যেখানটায় আমি রয়েছি, সেখানে "আমি দুর্গা পেয়েছি", এ ভাব এখনও

হয় নাই। যে অব্যক্ত ঘর থেকে আমি ব্যক্ততা নিয়েছি, সেটা এখনও আমার চখে ঠেকে নাই। যেটা ব্যক্ত হয়ে ফুটেছে, সেইটাই মাত্র চখে ঠেকছে। অর্থাৎ এখনও পরম পুরুষার্থ প্রষ্ট হয় নাই। কিন্তু এ সব পেতেই হবে।

সময়, কাল ও মহাকাল।

সূর্য্য পৃথিবীকে নিয়ে অসীম গতিতে ছুট্‌ছে। সূর্য্য থেকে এ পৃথিবী যখন ছিট্‌কে বেরিয়ে এল, তখন পৃথিবীও সেই গতিশক্তি নিয়ে সেই রকম ছুটতে লাগল। তার পর পৃথিবী সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তিতে আটকে গিয়ে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরতে লাগল। পরে দেখা গেল, সেই ঘোরার চাইতে পৃথিবীর নিজের ঘূর্ণনটা বেশী স্পষ্টতর হয়েছে অর্থাৎ সে নিজে নিজে পাক খাচ্ছে। এখানে তিনটা গতি দেখা যাচ্ছে,— ১। প্রথম গতি হল একটা বিপুল শক্তি—যেমন একটা মোটরগাড়ী চলে গেলে রাস্তার ধুলা তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে থাকে। এই বিপুল শক্তির অসীম গতিই হলেন মহাকাল। ২। দ্বিতীয় গতি হল বর্ষ বা বর্ষণের ন্যায়; যা থেকে ছুটছে, তারই চারি দিকে ঘুরতে থাকে। এই গতি থেকে বর্ষ হয় এবং ইনিই হলেন কাল বা বিষ্ণুত্ব। ৩। তৃতীয় গতি হল ঘূর্ণীপাকের ন্যায়। নিজের চারি দিকে নিজে ঘুরছে ঘূর্ণীপাকের মত। এই হল ব্রহ্মার গতি। এরই ভোক্তা আমরা এবং এর নাম সময়। সং+অয় বা সমং যময়তীতি

সময়ঃ। সমত্বের প্রাপ্তি এবং একত্বে পর্য্যবসিত হওয়ার নামই সময়। এই যে আমাদের জীবত্ব, এটা এই সময়রূপ পাকের বশবর্ত্তী। কিন্তু এটা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ঐ গোলপাক বা কালের গতির দ্বারা। তা হলে জীবের ঘোরার নাম হল সময়, বিষ্ণুর ঘোরার নাম সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মক কাল, আর অনির্ব্বচনীয় ঘোরা হল মহাকাল। আমি খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, বেড়াচ্ছি, এই যে জীবনের কাজ, এটা হল সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক ঘোরার ফল—সেই কালগতি থেকেই এই ঘূর্ণীপাক খাচ্ছি। এতে অয়নজ্ঞান চলতে থাকে। ছোট গতিগুলো বড় গতি থেকে জাত হয়েছে। সেই জন্য সময়জ্ঞানকে কালজ্ঞান বলে চিনতে হয় এবং কালজ্ঞানকে মহাকালজ্ঞান বলে চিনতে হয়। সময় একটা গতি, কালও একটা গতি। এই যে কালাত্মক গতি, এতে যদি তোমাদিগকে থাকতে দেখি, তবে বুঝব, তোমাদের কালজ্ঞান হয়েছে। সুতরাং আমরা যখন বলি—সময়ে পূজা কর, তখন এই কালজ্ঞান থাকা চাই। সময় বললে আমার নিজের স্থিতির জ্ঞান দেখতে হবে। যিনি ব্যাপক দেবতা—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ক্রিয়া করছেন, তাঁর গতির একটা বেগ হল সময়। আমার একটা পরিবর্ত্তন হল—যৌবন থেকে জরা, জরা থেকে মৃত্যু, এক পা এগিয়ে গেল; এটা সময় নয়; একে কলনজ্ঞান বলে দেখবে। মশায়! আমি আপনার কাছে চার বছর আসছি; এটা কলনজ্ঞান নয়—এটা সময়জ্ঞান। আমি চার বছরে এই উপদেশ

পেয়েছি ; এর নাম কলনজ্ঞান—কালজ্ঞান। যে উপদেশে আমার বিভিন্ন অবস্থা হয়েছে, সেই হল কলন। মহাকাল-তত্ত্ব হল এরূপ, যেখানে নাকি সমস্তই তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন হয়ে যায়। বলা, হওয়া, বোধ করা, সব কিছুই সেখানে তৎক্ষণাৎ—চড়াৎ করে হয়ে যায়। অধ্যাত্মে, ভাবের ঘরে যখন থাক, তখন তোমরা বিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ করে ভ্রমণ কর।' আর যখন কালের ঘরে বা মন্ত্রচৈতন্যের ঘরে থাক, তখন সব চড়াৎ করে ফুটে যায়।

কয়েকটি উপদেশ।

১। বরফ যেমন জল হইতে জন্মে, জলেই থাকে (অর্থাৎ তাতে জল ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় না) এবং জলেই লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমি যাঁতে জন্মেছি, যাঁতে রয়েছি এবং যাঁতে লয় প্রাপ্ত হব, সেই চেতনা আমার আত্মা। চেতনাই আমার ভগবতী, চেতনাই আমার সর্ব্বস্ব। এইরূপ আত্মবোধাত্মক লোককেই ব্রহ্মলোক বলে।

২। চেতনাকে বা ভগবতীকে দেখলেই দেখি যে, আমি তাঁর আশ্রয়ে—তাঁর বুকে রয়েছি। তিনিই আমার বিদ্যা, বুদ্ধি, সুখ দুঃখ, সর্ব। তাঁকে না দেখলেই আমি পরাধীন

জীবমাত্র। ভগবতী ও তাঁহার বিলাস দেহাদি "আমি" দ্বারা সংযুক্ত। ভগবতীর বুক দিয়ে "আমি" গড়া। তাই মা হ্রীং।

৩। বাহিরে আমি খেলায় মত্ত। কিন্তু ভিতরে দেখলে দেখি, আমি জ্ঞান নিয়ে মত্ত। তখন জ্ঞানময় ভূমি পেলাম। পরে দেখি, জ্ঞানময়ী মাকেই পেয়েছি। আরও গূঢ়ে দেখি, জ্ঞানময়ী মাই খেলা করছেন—আমাকে অনুভোক্তা ক'রে।

৪। ভগবতী সহস্রারে থেকে আমাকে চালাচ্ছেন—এ না দেখলে কর্ম্মফলের হাত থেকে নিষ্কৃতি নাই। আর দেখলে কর্ম্মফল ত স্পর্শ কর্বেই না, পরন্তু বিমল শান্তি, সিদ্ধি ও মুক্তি লাভ হবে। যেমন সুবর্ণরেখা নদীতে লোকে খুঁজে খুঁজে এক আধ টুকরা সোনা পায়। কিন্তু খনিতে উপস্থিত হলে প্রাপ্তি অপর্য্যাপ্ত।

৫। আমি যে আমার বর্ত্তমান জন্মের কৃত কর্ম্মই জানি, তা নয়। এ জন্মের ভোগ দেখে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম এবং ইহ জন্মের কর্ম্ম দেখে পরজন্মের ভোগও আমি অনুমান করিতে পারি। সুতরাং ভগবতীর টুকরা আমিও ত্রিকালজ্ঞ হতে পারি।

৬। তোমার নিজের দিকে চেয়ে, তুমি যদি নিজেকে মানুষ বলে না দেখে, একজন বাঙ্‌ময় দেবতা বলে দেখ, তবেই তোমার ঠিক দেখা হবে।

৭। জ্ঞানক্রিয়ার তলায় যদি আত্মবোধ না থাকত, তবে ভাব যে মাতৃস্বরূপ, এ কথা বলা যেত না।

৮। আমার জীবত্বের দিকে চাহিয়া 'আমি' না বলিয়া, ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর দিকে চাহিয়া 'আমি' বল্‌লেই ঠিক বলা হয়।

৯। আগে যে দিকে চাইতাম, ভূত দেখতাম; এখন যে দিকে চাই, ভগবতী দেখি।

১০। খরস্রোতের প্রতিকূলে ঘোর তুফানে একজন হাল ধরে নৌকা চালিয়ে নিচ্ছে। হাল একটু বেক্‌লেই—নির্ভরতা একটু তরল হলেই বিপদ্।

১১। মহান্ দেবতার বুকে তোর অভিব্যক্তি; তাই তোকে ব্যক্তি বলে।

১২। যিনি দ্রষ্টা, তাঁর দর্শনশক্তি কেড়ে নিলে তিনি আর দ্রষ্টা থাকেন না; দর্শনশক্তি নিয়েই দ্রষ্টার সার্থকতা। এ শক্তি তাঁর। তা হলে তাঁর শক্তি কি তিনি নন? তিনিই দ্রষ্টা, তিনিই দর্শনশক্তি; আপনি আপনার মহিমা। আলো থেকে উজ্জ্বলতা, জল থেকে শৈত্য যেমন কেটে নেওয়া যায় না, দ্রষ্টার দর্শনশক্তিও তেমনি কেটে নেওয়া যায় না।

১৩। জানা তিন রকমে হয়—মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে ও আত্মত্ব দিয়ে। আমি মাটি, জল, আগুন দেখি, আমা হতে ভিন্ন অন্য কোন পুরুষকে দেখি, এ হল পরবোধ এবং ইহাকে বলে মন দিয়ে দেখা। আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, আমার বাড়ী, এই হল আপন বোধ, আত্মীয় বোধ; একে বলে প্রাণ দিয়ে দেখা। আত্মত্ব দিয়ে দেখা মানে নিজেই তাই হয়ে যাওয়া। আমি ছবি দেখছি মানে আমার দর্শনশক্তি ছবির

আকার গ্রহণ করেছে। তখন আমি ছবিই হয়ে গিয়েছি। ছবি ভিন্ন আমার অন্য অস্তিত্ববোধ হারিয়েছি। সুতরাং দ্রষ্টা নিজেই নিজের দর্শনশক্তি, নিজেই নিজের দৃশ্য। অতএব দ্রষ্টা, দর্শনশক্তি ও দৃশ্য একই। বাইরে দেখা মনের দর্শন; অন্তর্গত করে দেখা প্রাণের দর্শন, আর নিজে তাই হয়ে যাওয়া আত্মার দর্শন।

১৪। তোমার বাড়ীতে গেলে তুমি আমার সম্বর্দ্ধনা কর, না আমার কাপড়ের সম্বর্দ্ধনা কর? মা লক্ষ্মী ধান ও তুলা প'রে দাঁড়িয়েছেন। তুমি ঐ ধান ও তুলাতে মা লক্ষ্মীর পূজা করলে। তোমার ঐ পূজায় কি মা লক্ষ্মী প্রসন্ন হবেন? শালগ্রামে শিলাবোধ করলে নারায়ণপূজা ব্যর্থ হয়, গুরুকে মানুষবোধ করলে গুরুপূজা ব্যর্থ হয়। সেইরূপ ধান ও তুলায় মাত্র ধান ও তুলা বোধ করলেও মা লক্ষ্মীর পূজা ব্যর্থ হয়।

১৫। "চেতনশুদ্ধি" মানে চেতনতত্ত্বই যে স্থূল জগৎ হয়েছেন, তাই জানা। চেতনতত্ত্ব মানে আপনতত্ত্ব। সেই আপনি মাটির চেহারা ধরেছেন। তিনি আপনি আপনাকে আপনার দ্বারা তৈরি করেন, পরিচালন করেন ও তৃপ্তি দান করেন। আত্মবোধই সব জায়গায় স্থূল হয়ে আপনার পরিচয় দিচ্ছেন—আমি আকাশ, আমি বাতাস, আমি জল, আগুন, মাটি বলে। সবই বোধস্বরূপের বোধভঙ্গিমা। তার মানে ভাষার মূল যে অক্ষর, তার প্রকাশ। বোধ ফুটছে মানে

বর্ণ ফুটছে। বর্ণ মানে আপনি বর্ণিত হচ্ছেন—আপনি আপনাকে বরণ করছেন।

১৬। "মননাৎ ত্রায়তে ইতি মন্ত্রঃ।" মনন করা মাত্রেই পরিত্রাণ করে—অমৃতত্ব দান করে, তাই এর নাম মন্ত্র। শুধু কথা নয়।

১৭। গুরু, সর্ব্বজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। যাঁর উপদেশ শোনামাত্র এই পেয়ে যাচ্ছি, হয়ে যাচ্ছি, এরূপ মনে হয়, তিনিই প্রকৃত গুরু। এইরূপ গুরুই যোনিমুদ্রা, মন্ত্র-চৈতন্যাদি শিক্ষা দিতে পারেন।

১৮। শিরশ্ছেদ মানে তোর মাথাটা ভগবতীর মাথা হয়ে যাওয়া। মাথাশুদ্ধ শরীর আমি, এরূপ জ্ঞানই হল পশুপাশ। এখানে তুই পশু হয়ে গেছিস। ভগবৎকামনা জাগলেই তেজ জাগে, কাল জাগে; কালীর খাঁড়ায় তখন মাথা কাটা যায়। সঙ্গে সঙ্গে মাথাও ভগবতীর হয়ে যায় এবং তিনি তোর নিয়ন্ত্রী হন।

১৯। ঘুমের সময় যেমন নিশ্চিন্ততা আসে, তেমনি ভগবতী বলে মাথা কাটা গেলে—মাথা ভগবতীময় হলে, সব চিন্তা দূর হয়ে যাওয়া চাই। ভগবতীও বল্‌ব, আবার দশ হাজার চিন্তাও করব, এ হলে ভগবতী বলা হ'ল না। ভগবতী বললে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে হবে। যদি না পার, অস্বস্তির মধ্যে থাকবে।

২০। বাক্‌ ততক্ষণ বাক্যরূপে থাকেন, যতক্ষণ না

উঁহাকে শিবশক্তি বলে চেনা যায়। বাক্ হলেন "দোগ্ধ্রী"। ইনি বেরিয়ে আসেন নিজেই দুগ্ধ, গো ও দোহনমূর্ত্তি ধরে।

২১। অবোধ ব্যক্তি চুণিপান্না পেলেও কাঁকর বলে তাকে রাস্তায় ফেলে দেয়। আমরাও তেমনি বাক্ (কথা) ও নিজ (আত্মজ্ঞান), এই দুটি মহামূল্য রত্নকে রাস্তায় ফেলে দিয়েছি; তাই আমরা চিরদরিদ্র।

২২। আত্মত্ব হলেন যক্ষস্বরূপ—অসীম অনন্ত ধনভাণ্ডার। এঁর ভিতর অনন্ত ধনরত্ন নিহিত আছে, কিন্তু বাইরে থেকে তা বুঝা যায় না। এঁকে দেখে মানুষ বললে মানুষ হব; দেবতা বললে দেবতা হব, ভগবতী বললে ভগবতী হব।

২৩। খড়ের ভিতর দিয়ে অগ্নি চলে গেলে, সে খড়কে জ্বালিয়ে অগ্নিময় করে যায়। ভগবতীও তেমনি যেখানে যাতায়াত করেন, সব জ্বালিয়ে ভগবতীময় করেন। এই হ'ল মন্ত্র। কথা ও মন্ত্রে এত পার্থক্য।

২৪। আমার মন মাটিতে পড়লে তাকে দেখি আমি মড়া, কিন্তু ভগবতীতে পড়লেই সে জ্যান্ত হয়ে যায়।

২৫। তাঁতে ও আমাতে আদান-প্রদানের দ্বার হলেন সূর্য্য; সূর্য্যের মধ্য দিয়ে তিনি দেন আমাকে, আমি দিই তাঁকে। "এতৎ বংশদণ্ডং হৃদয়চক্রম্"। এই মধুচক্র মুখ ফিরিয়ে আছে আদিত্যের দিকে। সব মধু খাচ্ছেন আদিত্য। আমার ভিতর দিয়ে ধারা বয়ে যাচ্ছে আমাকে

ভিজিয়ে। এইটি দেখলেই সব একরসে, আনন্দরসে, ভগবতী-রসে পর্য্যবসিত হয়।

২৬। "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।" শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস গন্ধ—এগুলিই হল চিত্তের আহার। এ সকলকে ভগবানের রূপ বলে দেখলেই তোমার আহারশুদ্ধি হ'ল। আর প্রতি বস্তু, প্রতি চিন্তাকে ভগবান্ বলে যদি না দেখতে পার, তবেই তোমার আহার অশুদ্ধ রয়ে গেল।

২৭। যিনি আমার জন্মজন্মান্তরীয় ইতিহাস ও অনুভূতি নিয়ে উপস্থিত হন, তাঁহারই নাম ধ্রুবা স্মৃতি বা ভগবতী।

২৮। আমাদের সকলেরই সংস্কার মায়ে গাঁথা আছে। এক মা সবার মা হয়েছেন; তাই সকলেরই ইতিহাস তাঁতে গাঁথা রয়েছে। কিন্তু তাঁর নিজের গাঁথা আছে যে, এরা আমারই ছেলে।

২৯। কুঁচলে বিষ শরীরে ঢুক্‌লে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ক্রিয়া কর্‌তে কর্‌তে ছোটে। আমি যদি ভগবতীকে ডাকি ত তিনিও তেমনি করে আমার সকল শরীরের প্রতি অণু-পরমাণুর ভিতর দিয়ে ছুটে আসবেন।

৩০। যে দেখবে—গুরু নিজেই মহিমময় হয়ে আমাতে প্রতিফলিত হচ্ছেন, সে অন্তরঙ্গ শিষ্য। আর যে দেখবে, গুরুর প্রকাশে আমিই মহিমময় হচ্ছি, সে বহিরঙ্গ শিষ্য।

৩১। সুদাম কৃষ্ণকে খুদভাজা দিতে এনেছিল, কিন্তু দিতে সাহস করে নাই। কি এনেছ, দেখি, বলে কৃষ্ণ সেই

খুদভাজা কেড়ে খেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার কামনার, অভাবের, দুঃখের ঝুলিও দেখে নিলেন। সে ফিরে গিয়ে বিপুল ঐশ্বর্য্য পে'ল। আমরা কেবল আমাদের দুঃখের ঝুলিই দেখি, আমাদের মালিন্যই দেখি; তাঁকে এই খুদভাজা দিতে চাই না। নিজেদের ক্ষুদ্রতা যা আছে, তাঁকে সব দিতে হবে; ক্ষুদ্রতা তিনিই, এই বলে দেখতে হবে। তা হলেই দুঃখ দারিদ্র্য দূর হবে ও সমস্ত অমৃতময় হয়ে যাবে।

৩২। যার ভগবতীতে সংশয়শূন্য শ্রদ্ধা এসেছে, সে ভগবতী বল্লেই তাঁকে পেয়ে যায়। এমন রত্ন বুকে রেখেছি, যা থাকলে আর মরব না বা কেউ টেনে ফেলতেও পারবে না, সে অমূল্য রত্ন ভগবতী।

৩৩। মন্ত্র আকারে যিনি বেরুচ্ছেন, ইনি দেবতাই, ইনি হিংকারই। ইনি যখন বেরোন—কাম, কাল, দিক্, দেশ, মন, ভূত, সব তৈরি কর্তে কর্তে বেরোন—বর্ষিত হ'তে হ'তে গলে পড়েন। তিনি নিজে জলময়; যাতে পড়ছেন, সেও জলময়—প্রাণময় হয়ে যায়। আত্মা ও বাক্তত্ত্বে বিশ্বাসবান্ হলে এই সমগ্র জগৎ, দেবতা এবং তোমার খুটি-নাটি সমস্তই তোমার মুঠোর ভিতরে এসে যাবে।

৩৪। ঘুমন্ত বাঘের লেজে হাত দিলে সে যেমন বিদ্যুদ্বৎ উঠে দাঁড়ায়, তেমনি সত্যজ্ঞানে সত্যের মাকে ডাক্লে তৎক্ষণাৎ তিনি ফল দান করেন।

৩৫। শত অপরাধে অপরাধী হ'য়েও সত্যবোধে ভগবতীর

দিকে চোখ দিলে মা অমনি বলে ওঠেন—বৎস, ভয় নেই—এই যে আমি। এ কবিতা নয়—কাহিনী নয়—সত্যই এরূপ ঘটছে।

৩৬। যতক্ষণ "মা" বলা শুনিস্ নি, জানিস্ নি, তার কথা আলাদা। এখন যখন বা বল্‌তে শিখেছিস, তখন আর কর্ম্মফল দেখবি কেন?

৩৭। ভগবতী বল্‌লে—স্বরাট্, বিরাট্ ও সম্রাট্, এই তিন মূর্ত্তিতে তাঁকে যুগপৎ দেখতে হবে।

৩৮। ব্রহ্মযজ্ঞ—মহাদানযজ্ঞ। রাজা বিলাতে থেকে কর্ম্মচারীর দ্বারা কাজ চালাচ্ছেন, এ তেমন নয়। সর্ব্বঘটে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে ভোগ দিচ্ছেন। জীবের এ কি সৌভাগ্য! ধন্য এ জীবত্ব, যাতে নাকি জগজ্জননীর সঙ্গে আমরা নিত্যসংযুক্ত, এ উপলব্ধি হতে থাকে। মা যেমন ছেলের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে, তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। কেহই তাঁর চোখের বাইরে নয়।

৩৯। সম্ভূতিময়ী ভগবতী আপনি বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং জীব, তাঁর নানা মূর্ত্তিবৈচিত্র্য অনুবোধ করছে, এইরূপ দেখলেই দেখা হ'ল—মা একা বহু সন্তান বুকে করে দাঁড়িয়ে আছেন।

৪০। তুমি যেমন করেই চল—সে চলা মাটিতেই, যেমন করেই সাঁতার কাট—সে সাঁতার কাটা জলেই, তা ছাড়া অন্য

কোথাও হয় না। তেমনি জড়, চেতন, দেবতা—যাহাই দেখ, তা ভগবতীতেই দেখছ, অন্য কোথাও নহে।

৪১। ভগবতী বলবামাত্র তৎক্ষণাৎ শরীরজ্ঞান উড়ে যাওয়া চাই। তুমি "বেদ" জেনেছ কি তৎক্ষণাৎ বেদ হয়ে গেছ। ভিতরে অনুভূতিতে বেদ, বাহিরে—বিরাটে দেব। দেবতা না এলে বেদ আসে না, তেমনি বেদ ছাড়া দেবতাও আসেন না; প্রাণ ও প্রজ্ঞা যুগপৎ চলে।

৪২। আমার চোখে রূপ এল না—রূপময়ী ভগবতী এলেন। আমার কাণে শব্দ এল না, শব্দময়ী ভগবতী এলেন। আমার নাকে গন্ধ এল না, গন্ধময়ী ভগবতী এলেন। আমার রসনায় রস এল না, রসময়ী ভগবতী এলেন। আমার ত্বকে স্পর্শ এল না, স্পর্শময়ী ভগবতী এলেন। এ কি জন্ম স্থিতি আমার? কে আমি? ভগবতী দ্বারা অন্তর্বহিঃ আলিঙ্গিত।

৪৩। বোতলে গ্যাস পোরা রয়েছে, ছিপি খুলে দিলেই সে ভর্‌ভর্ করে বেরোতে থাকে। তেমনি তোর ভিতরেও শক্তি স্তরে স্তরে সাজান আছে; নোঙর তুললেই মায়ের বুকের উপর দিয়ে সরসর করে চলতে থাকবে।

৪৪। আমি ও মায়ের ব্যবধান ঘুচে যাবে—যদি আমি আমার নিজেকে—চিন্ময়ীকে—জ্ঞানময়ীকে ভগবতীরূপে দেখি।

৪৫। কেউ চুরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে তবে তাঁকে পাচ্ছে। আর যার দৃষ্টি পড়েছে যে, তাঁর বুকেই ত রয়েছি, সেখানে করছে—এঁকে ত পেয়েই আছি।

৪৬। সত্য মা আছেন এবং আমি ঠিক তাঁকে ডাকছি, এই জ্ঞান পাকা না হওয়ায় অর্থাৎ সত্যজ্ঞান না থাকায় "মা" বলে ডাকলেও ঐ অব্যক্ত পরদা ভেদ কর্‌তে পারি না, তাই মা সাড়া দেন না।

৪৭। আমার জ্ঞান মাটির মূর্ত্তি ধরেছে, তাই মাটিকে 'মা'টি দেখছি। ভূতমূর্ত্তির তলায় জ্ঞানমূর্ত্তি, তার তলায় নিজবোধ—জ্যান্ত মাটি। তবেই বলি—ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ। এইরূপ দেখে যদি মাটিতে চিম্‌টি কাটি ত মা বলবেন—পূজা করছিস্ তা চিমটি কাটিস্ কেন?

৪৮। যখন বলি—নিজেই সব হয়েছি, তখন জীবজ্ঞানটা সরে যাওয়া চাই। মানুষ আমি চন্দ্র হয়েছি, এরূপে এক সঙ্গে মানুষবোধ ও চন্দ্রবোধ থাকতে পারে না; জীববোধ ধ্বংস হবে। এর নাম বলিদান, এর নাম মাথা কাটা, এর নাম মন্ত্রচৈতন্য—যা বলা, তাই হয়ে যাওয়া। যতক্ষণ জীববোধ থাকে, ততক্ষণ আমি মরণশীল—পরাজিত—পরাভূত। আর ভগবতীর সারূপ্য পেলে জ্যান্ত দেবতা—বিশ্বের নিয়ন্তা। এখন দেখছ সব মড়া জগৎ; যেমনি মাথা কাটলে, পশুপাশ ছেদন হ'ল, অমনি সমস্তই সর্ব্বশক্তিময়ী আনন্দময়ী ভগবতী হয়ে গেল।

৪৯। যিনি অক্রমদর্শী নিয়ন্তা, তিনি কালমূর্ত্তি নিয়ে সৃষ্টি স্থিতি লয় করছেন। এখানেই এক পীঠে নিয়ন্তা, অন্য পীঠে জীব ভোক্তা। মাতা ও সন্তান, এই উভয় আত্মত্ব পৃথক্

হলেও—মাগো, আমি তুমিই, এইরূপ দেখলেই সন্তান "মা" হয়ে গেল।

৫০। সহস্রারের দাতৃত্বের মধ্যে তুমি বসে আছ—চেতনা-দেবীর বুকে। সেই চেতনাকেই ভোগ করছ। চেতনা যদি চলে যায়, কিছুই ভোগ হবে না। তৃষ্ণায় জল খেলি, না মাকে খেলি? এখানে খাওয়া ব'লে আলাদা কিছু নেই, দর্শনেই আহার। আত্মতত্ত্বে খাওয়া, দেখা, ভোগ করা, এক কথা।

৫১। তোমাদের মন ও ইন্দ্রিয়ই জগদ্দর্শনের মূল; তাই তোমরা জগৎকে ভূত বলিয়া দেখ। যদি নিজেকে জগদ্দর্শনের মূল কর, তবে নিজেই জগৎ হয়ে যাবে, সেইরূপ বোধ করবে, সেইরূপ মন ও ইন্দ্রিয় পাবে। এরূপ হলে তোমাদের জ্ঞান আর ভূত দ্বারা অভিভূত থাকবে না। দেবীর দ্বারা পরিচালিত হবে। "সুখ" এই মূর্ত্তি ধরে তিনি আপনি আপনাকে ভোগ কচ্ছেন। আমি তুমি নেই, এক পরমদেবতা ভোগ্য, ভোক্তা ও প্রেরক হয়ে লীলা কর্ছেন। ইনি স্বাধীন আনন্দময়।

৫২। শিরশ্ছেদ মানে মায়ের অধ্যাত্মভূমি লাভ করা—সকল জগতের অধীশমূর্ত্তিকে পাওয়া, অর্থাৎ বেদনের দ্বারা তোমার নিজত্ব তাঁর নিজত্বে লাগিয়ে নিজে জগন্ময় হওয়া। তখন মনে হবে, জগৎটা আমার নিজের অরাবিস্তার—জ্যোতিবিস্তার—প্রাণবিস্তার—অনুভূতিবিস্তার। গায়ে চিমটি কাটলে যেমন অনুভূতি হয়, মাটিতে চিমটি কাটলেও তখন তেমনি অনুভূতি হবে।